সাহিত্য-সন্দর্ভ।

গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সোপান প্রভৃতি
পুস্তক প্রণেতা

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী বিরচিত।

কলিকাতা,

২১০।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
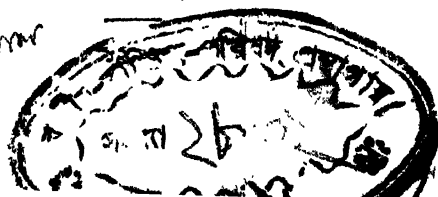
ভূমিকা।

বঙ্গ বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপনা জন্য অনেকগুলি সাহিত্য-পুস্তক বর্ত্তমান রহিয়াছে; সাহিত্য-সন্দর্ভ সেই প্রাচুর্য্য আরও বর্দ্ধিত করিল। ইহা দ্বারা কোনও প্রয়োজন সাধিত হইবে কি না, ইহা শিক্ষার্থীদিগের কোনরূপ উপকারে আসিবে কি না, সে বিচার অপরে করিবেন; আমি তৎসম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, এক শ্রেণীতে এক পুস্তক পুনঃ পুনঃ অধীত হইলে শিক্ষা কার্য্যের সজীবতা বিনষ্ট হয়; শিক্ষা দান ও গ্রহণ উভয়তঃই উহা অমঙ্গলকর। পাঠ্য পুস্তকের প্রাচুর্য্য থাকিলে কর্ত্তৃপক্ষগণ তন্মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট পুস্তকগুলি পর্য্যায়ক্রমে নির্ব্বাচন করিয়া সে অনিষ্টের নিরাকরণ করিতে সহজে সমর্থ হইতে পারেন, এবং তাহা হইলে সঙ্কীর্ণ বঙ্গভাষার প্রসারও ক্রমে বর্দ্ধিত হয়।

এই পুস্তকের কোন কোন প্রবন্ধের সঙ্কলনে নানা প্রকার সংবাদ ও সময়িক পত্রের এবং বিবিধ গ্রন্থাদির উপরে স্থানে স্থানে নির্ভর করিতে হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থকার ও সম্পাদকের পুস্তক পত্রিকাদি হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট এস্থলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই গ্রন্থে যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অধুনাতন প্রামাণিক ইংরেজী বৈজ্ঞানিক-গ্রন্থ সমূহের মাতানুসরণক্রমে লিখিত হইয়াছে।

কলিকাতা,
২০এ মাঘ, ১২৯৩।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

সূচীপত্র।

সাহিত্য-সন্দর্ভ।

অসাধুর বিপদ।

অনেকে ধন মান ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের নিমিত্ত সদাচারী ও সাধু হন; তাঁহাদের সাধু ব্যবহারের তদপেক্ষা কোনও মহত্তর উদ্দেশ্য থাকে না, সুতরাং যে স্থানে লাভের অঙ্ক বর্ত্তমান নাই সেখানে তাঁহারা সাধুতার কৃত্রিম পরিচ্ছদে আপনাদের কুৎসিত মনোবৃত্তি গুলিকে আবৃত রাখিতেও অভিলাষ করেন না। কিন্তু যাঁহারা সাধুতার অনুপম মাধুর্য্য উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা সেই মধুরতার জন্যই সদাচরণশীল হইয়া থাকেন।

ধার্ম্মিক ও সুশীল ব্যক্তি যে অতুল গৌরবের অধিকারী তাহা লোক মাত্রেরই প্রলোভনের বিষয়। সাধুতার গৌরব ও মহিমার সহিত বিবিধ সদ্‌গুণ সুশিক্ষা অথবা অপর কোনও মূল্যবান সম্পদেরই তুলনা হয় না। মনুষ্যমনের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখাযায় উহা স্বভাবতঃই সৎপথে ধাবিত হইতে আকাঙ্ক্ষা করে এবং সাধু ব্যক্তির গৌরব করে। মানুষ স্বয়ং যে দোষে দোষী, সে দোষও অপরের দেখিতে পাইলে তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করে ও লোক সমক্ষে তাহার নিন্দাবাদ প্রচার করে; এবং যাঁহারা ধার্ম্মিক ও সুশীল তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে।

পরন্তু মনুষ্য যদি এরূপ মানসিক অধোগতিতেও উপনীত হয় যে, তাহার মনে আর ধর্ম্মের প্রতি গৌরব থাকে না, সৎকার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্র আস্থা থাকে না, ন্যায় অন্যায়ের বিচার শক্তিও থাকে না, তথাপি স্বীয় মঙ্গলের জন্য সকলেই সৎলোকের সাহায্য পাইতে চেষ্টিত হয় এবং বিবিধ বিষয় ব্যাপারে অথবা যে কোনও গুরুতর কার্য্যে অসাধু লোকের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে সকলেই কুণ্ঠিত হয়। ইহা সাধুতার অপরাজিত মহিমার সুন্দর নিদর্শন এবং অতুল গৌরবের সুস্পষ্ট চিহ্ন।

সাধুশীল হওয়া সকলের পক্ষেই তুল্য প্রয়োজনীয়। যাঁহারা জন্মগুণে অথবা ভাগ্যক্রমে ধনমানে অগ্রগণ্য হইতে পারিয়াছেন, স্বার্থের কুহকে অথবা সামাজিক অসামঞ্জস্যের প্রতাপে যাঁহাদের নামে যশের ডালি উপহার দিতে অনেকেই চির লালায়িত, সেই ভাগ্যবানদিগের পক্ষেও চরিত্রের পবিত্রতা অতি আবশ্যক। যাঁহারা ঈশ্বরের বিধি লঙ্ঘন করাকে পাপ অথবা দোষের বিষয় মনে না করেন; এবং সাধুতার মাধুর্য্য ও গৌরব যাঁহাদের বিকৃত মীমাংসার নিকট অতি তুচ্ছ পদার্থ; অন্ততঃ অসাধুতার সাংসারিক বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও তাঁহাদের সৎপথ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। অসচ্চরিত্র ব্যক্তি যেরূপ অবস্থাপন্নই হউক না কেন এবং যতই সম্পদ রাশিতে পরিবেষ্টিত থাকুক না কেন, সে সাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভে কখনই সমর্থ হয় না। অসাধু ব্যক্তি আপনার আত্মীয় স্বজনের নিকটেও নিতান্ত হেয় বলিয়া পরিগণিত হয়, বন্ধুবর্গও তাহাকে যথোচিত প্রীতি ও বিশ্বাস

করে না। যাহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই, সমাজে বাস করিতে হইলে যে তাহাকে বহু লাঞ্ছনা ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

পরন্তু অসাধুতায় পার্থিব সম্পদ্‌লাভের দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে। অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও কেহ কেহ প্রচুর সম্পদের অধিকারী হন; এবং অর্থের বশে কিয়ৎপরিমাণে মান সম্ভ্রমও উপার্জ্জন করেন। কিন্তু সেই সকল গুণপুরুষের যে অবৈধ চেষ্টায় সম্পদ রাশি অর্জ্জিত হয়, অনেক স্থলে উহাই তাহাদের চির অশান্তির কারণ হইয়া থাকে। তাহারা যে কণ্টকাকীর্ণ বিপদ সঙ্কুল পিচ্ছিল পথে ভ্রমণ করিয়া অভীষ্ট সাধনে নিরত থাকে, ফলিতার্থে তৎসন্নিধানে সুখের নিকুঞ্জ-কানন অথবা শান্তির শীতল ছায়া কুত্রাপি বিদ্যমান নাই, বরং তৎপরিবর্ত্তে সেই কুটিল বর্ত্তের বামে ও দক্ষিণে নিকটে ও দূরে কেবল বিপদ রাশিই মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাদের অনবধানতার ছিদ্রান্বেষণ করিতে থাকে। যদিও সেই বিচক্ষণ পুরুষদিগের সচকিত দৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী বিপদরাশির প্রতিকূলে নিয়ত আবর্ত্তিত হইতে থাকে, এবং প্রতি পাদক্ষেপে পুরোবর্ত্তী কণ্টকরাশির দূরীকরণে যদিও তাহারা নিয়ত সচেষ্ট থাকে, তথাপি সেই পিচ্ছিল পথে পদস্খলনের আশঙ্কা বিদূরিত হয় না। একবার স্খলিত-পদ হইলে আর তাহাদের রক্ষার উপায় থাকে না; তখন বিপদরাশি চারি দিক হইতে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। পৃথিবীতে তাহাদের সাহায্যকারী লোকের সংখ্যা অতি অল্প, অতএব তাহারা প্রতি-

কারের পথ খুঁজিয়া পায় না; সুতরাং বিপদের আক্রমণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া অচিরে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়।

পরন্তু যদি তাহারা বড়ই সৌভাগ্যশালী হয়, তাহাদের ক্ষমতা যদি এতই অধিক হয় যে, বিপদরাশি তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হইতে পারে না, তথাপি তাহাদের জীবন কদাচ সুখের জীবন হয় না। সম্ভবতঃ তাহারা অনেকের ন্যায্য স্বার্থ বিনাশ করিয়াছে, অনেক অনাথ অনাথিনীর উপর মর্ম্মান্তিক অত্যাচার করিয়াছে, অনেক সংসারানভিজ্ঞকে গুরুতররূপে প্রতারিত করিয়াছে, সুখের দিনে অথবা দুঃখের দিনে সেই স্বার্থ-ভ্রষ্ট ব্যথিত প্রতারিতদিগের দুঃখ কাহিনী স্মৃতি পটে অঙ্কিত হইয়া যে তাহাদিগকে বিচলিত না করে কে বলিতে পারে? সেই ব্যথিত প্রতারিত স্বার্থভ্রষ্টদিগের অভিসম্পাতে সত্য সত্যই তাহাদের কাল্পনিক সুখের আসন কম্পিত হয়। পরন্তু তাহাদিগের মর্ম্মবেদনা অলক্ষিতে ঈশ্বরের দ্বারে উপনীত হইয়া অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সেই অভ্রান্ত বিচারকের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়। মঙ্গল বিধাতার রাজ্যে তাহারা বিদ্রোহী প্রজা সুতরাং ভগবান তখন আপনার বিশ্বজনীন শাসন দণ্ডে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ তাড়না করিয়া সৎপথের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকেন। তখন তাহাদিগের স্বরচিত সুখের সিংহাসন দূরে পড়িয়া থাকে।

অসাধু পন্থার যাত্রিগণ মধ্যে ঈদৃশ অকিঞ্চিৎকর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সাবধান লোকের সংখ্যাও বড় অধিক দেখা যায় না।

তাহাদের অনেকেই আরও অসাবধান এবং তাহাদের দৃষ্টির প্রসার আরও অদূরব্যাপী, সুতরাং তেমন লোক আরও সহজে বিপদ রাশিতে মগ্ন হয় এবং অসাধুতার পার্থিব পরাজয় বিষয়ে জন সমাজে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে।

পরন্তু সকলেই যে বিষয়ের প্রলোভনে অথবা পদ গৌরব লাভাকাঙ্ক্ষায় অসাধুতার শরণ লয় তাহাও নহে। অনেকে নানাবিধ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অসৎ পথ আশ্রয় করিয়া প্রলোভনের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। হায়, তাহারা আপাত-মনোরম বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া পরিণামে কি ভয়ানক দুর্গতিতেই না পতিত হয়! কুপ্রবৃত্তির সিদ্ধি লাভই মঙ্গলার্থীর পক্ষে অসিদ্ধি, বরং তাহার অসিদ্ধিই যথার্থ সিদ্ধি। কারণ কুপ্রবৃত্তির সিদ্ধিলাভে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না, ক্রমেই বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং যাহারা মনের সাময়িক অসুখ দূর করিবার জন্য বিবেকের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া প্রবৃত্তির আদেশে অনুচিত উপায় অবলম্বন করে, তাহাদের অসুখের কারণ দূর না হইয়া আরও বৰ্দ্ধিতই হয়। যদি তখনও তাহারা সৎ-পথে প্রত্যাবৃত না হয়, তবে পরিণামে সেই অনুচিত সুখ-লিপ্সা এরূপ উৎকট বিক্রম প্রকাশ করে যে, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের আর কিছুই বিদ্যমান থাকে না। তাহাদের দেহ মন এবং আত্মা পাপভারে একেবারে ভারাক্রান্ত হইয়া যায়। মান এবং সম্পদ, স্বাস্থ্য এবং সুখ সেই অর্ব্বাচীনদিগকে পদাঘাত করিয়া তখন দূরে চলিয়া যায়। ক্রমে শরীর রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইয়া পাপের জীর্ণ পতাকা রূপে সংসার ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে।

তখন পূর্ব্ব জীবনের আর কিছুই বিদ্যমান থাকে না; থাকে কেবল স্মৃতি আর বেদনা। সেই মর্ম্মান্তিক স্মৃতির জ্বালায় পাপীর হৃদয় দগ্ধ বিদগ্ধ হয়। মর্ম্মবেদনায় পাপী মুহুর্মুহু ক্রন্দন করে। মনে করে, জীবনের এই কলুষিত ভাগ স্বপ্নময় হউক। সেই কাল্পনিক স্বপ্ন সাগরের অপর তীরে যে পূর্ব্ব জীবনের সুন্দর মধুরিমাময় হাস্য দীপ্ত পবিত্র বেলা ভূমি তাহার নয়নাগ্রে প্রতিভাত হয়, তথায় ফিরিয়া যাইতে সে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে প্রস্তুত হয়; কিন্তু অতীতের সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে মানবের সাধ্য নাই, সুতরাং কেবলই তাহার যন্ত্রণামাত্র সার হয়।

সঙ্গীত-শক্তিশালী জলচর জীব।

স্থলচরদিগের মধ্যে বহু জাতীয় প্রাণী মধুরস্বরে গান করিতে সমর্থ ইহা সকলেরই পরিজ্ঞাত, কিন্তু মৎস্যাদি জল জন্তুর মধ্যেও যে সঙ্গীত শক্তিশালী প্রাণী বিদ্যমান আছে এ অদ্ভুত কাহিনী অতি অল্প লোকেই অবগত আছেন।

যদিও সুস্বর বিশিষ্ট জলচর প্রাণীর অস্তিত্ব সচরাচর প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু সময়ে সময়ে সমুদ্র যাত্রিগণ সাগরগর্ভ সমুত্থিত মধুর স্বর-লহরী শ্রবণ করিয়া আনন্দে পুলকিত এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। সামুদ্রিক ভ্রমণকারিগণ যদিও অনেক সময় তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত কল্পনায় অতিরঞ্জিত করিয়া মানব মণ্ডলির মনে বিস্ময়োৎপাদন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তথাপি কোন কোন জলচর প্রাণী যে সুস্বরশালী

একথা নিঃসংশয়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে। পরন্তু সাধারণ সামুদ্রিক ধীবরদিগের নিকটেও এই আশ্চর্য্য তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত নহে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌টেনেণ্ট হোয়াইট ভ্রমণ করিতে করিতে কেম্বোডিয়ার নিকটবর্ত্তী কোনও নদীমুখে উপনীত হন। তৎকালে তিনি ঐ নদীগর্ত্ত হইতে সমুত্থিত এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ করতঃ নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন বহু সংখ্যক বীণা, হারমোনিয়ম ও ঘণ্টা একত্রে ধ্বনিত হইতেছে। জাহাজ যতই নদীমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই ঐ শব্দ অধিকতর উচ্চ ও সুস্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল। কিয়ৎকালের জন্য বোধ হইল যেন জলযানের নিম্নভাগ হইতেই উহা সমুত্থিত হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে সেই ঐকতান বাদ্য এরূপ গভীর শব্দে ধ্বনিত হইতে লাগিল যে, তদ্দ্বারা জাহাজ কম্পিত হইতে লাগিল। হোয়াইটের সঙ্গে একজন চীন দেশীয় পরিব্রাজক ছিলেন; তিনি কহিলেন, ঐ নদীতে এক প্রকার মৎস্য বাস করে, তাহারাই এইরূপ মধুর স্বরে শব্দ করিয়া থাকে।

বোম্বাই নগরের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র ভাগেও বীণা ধ্বনিবৎ মনোহর শব্দ সময়ে সময়ে শ্রুত হইয়া থাকে। উহাও এক প্রকার মৎস্যের স্বর। ১৮৪৭ অব্দে কয়েক জন ইংরেজ সলসেট দ্বীপের নিকট নৌকারোহণে ভ্রমণ করিতে ছিলেন ঐ সময়ে তাঁহারা ঘণ্টা এবং বীণা ধ্বনিবৎ এক প্রকার সুমধুর শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা প্রথমে মনে করিলেন ঐ শব্দ তীরভুমি হইতে সমাগত, কিন্তু পরক্ষণেই স্পষ্ট

অনুভূত হইল, ঐ মনোহর স্বর-লহরী তাঁহাদের যানের চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তি-সমুদ্রগর্ভ হইতেই উত্থিত হইতেছে। নৌকার চালকদিগের নিকট সাহেবেরা শুনিতে পাইলেন, উহা এক জাতীয় মৎস্যের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। নাবিকেরা বোম্বাই উপকূলে ও তাহার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রভাগে অনেক বারই ঐ মধুর শব্দ শুনিতে পাইয়াছে।

১৮৪৮ খৃষ্টীয় শালে সার্ জেমস্ এমারসন্ ! টেনাণ্ট সিংহল দ্বীপে বটিকলোয়া নামক স্থানে উপনীত হন। তথাকার দুর্গপাদমূলে একটি হ্রদ আছে। তিনি শুনিয়াছিলেন ঐ হ্রদের মধ্য হইতে রাত্রিকালে, বিশেষতঃ চন্দ্রালোক-দীপ্ত রজনীতে বীণা ঝঙ্কারবৎ শব্দ সমুদ্ভূত হয়। তত্রত্য ধীবরেরাও তাঁহার সম্মুখে এ কথার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিল। অতঃপর তিনি একদা চন্দ্রালোকময়ী রজনীযোগে কয়েকজন ধীবরকে সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণে হ্রদের জলে গমন করিলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া উক্তরূপ শব্দ শ্রবণ করতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি বলেন, ঐ শব্দ বীণাতন্ত্রীর সুমধুরধ্বনির অনুরূপ বটে, কিন্তু দুই একটি স্বরের অনুবৃত্তি নহে, বহুবিধ সুরের সমন্বয় বলিয়া অনুভূত হয়। টেনাণ্ট্ সাহেব নৌকার নিম্নভাগের কাষ্ঠোপরি কর্ণ সংলগ্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন, ঐ শব্দ অধিকতর স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল।

এক সময়ে আমেরিকার গ্রেটাউন নামক বন্দরে কতকগুলি জাহাজের সন্নিকটে রজনীর কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে জলমধ্য হইতে সমাগত বীণাধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল।

কুসংস্কারাপন্ন নাবিকেরা উহাকে সাগরতলবাসী কোনও অপদেবতার কণ্ঠধ্বনি মনে করিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল। কিন্তু কতিপয় বুদ্ধিমান লোকের বিশেষ অনুসন্ধানে স্থির হইয়াছিল যে, উহা কোনরূপ জলচর প্রাণীর শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সমুদ্রের জলগর্ভ হইতে সমুত্থিত ঈদৃশ শব্দ আরও অনেকানেক সমুদ্রযাত্রীর ও ভ্রমণকারীর শ্রুতিগোচর হইয়াছে। সে সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আর প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি করিব না। পরন্তু কেবল যে দুই এক জাতীয় মৎস্যই ঈদৃশ সঙ্গীত-শক্তিশালী তাহাও নহে। যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, মৎস্যদিগের মধ্যে কতিপয় জাতি এবং শুক্তি ও শম্বুকদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি মধুরস্বরে শব্দ করিতে সমর্থ। ঐ সকল সঙ্গীতকারি-জীব সচরাচর গ্রীষ্ম-মণ্ডলস্থ সমুদ্রে ও কোন কোন নদী গর্ভে বাস করিয়া থাকে। পরন্তু ভ্রমণকারিগণ আরও কোন কোন অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণীর অদ্ভুত সঙ্গীত-শক্তির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের এতদ্বিষয়ক মনোহর বর্ণনা পাঠ করিলে অথবা তাহার মর্ম্ম অবগত হইলে নিরতিশয় চমৎকৃত হইতে হয়। সেই সকল বর্ণনা হইতে এস্থলে এক জাতীয় অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণীর সঙ্গীত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

কাপ্তেন উইডেন নামক একজন প্রসিদ্ধ ভূগোল-শাস্ত্রবিৎ যন্ত্রধ্বনিবৎ শব্দানুকরণকারী একটি অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণীর

যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিরতিশয় আশ্চর্য্য জনক। তাঁহার বর্ণনার এক স্থলের স্থূল মর্ম্ম এই।—উক্ত সাহেব এক সময়ে জলযানে আরোহণ করিয়া হল দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। একদা রজনীযোগে তাঁহার যানের কোনও নাবিক অকস্মাৎ অনতিদূরে মনুষ্য-কণ্ঠধ্বনির তুল্য অথচ অতি সুমধুর এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও কোন প্রাণী তাহার নয়নগোচর হইল না, অগত্যা শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। অবিলম্বে আবার পূর্ব্ববৎ মধুরধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। যে স্থানের এবং যে সময়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে, সেখানে তখন দিবা-লোকের পূর্ণ জ্যোতিঃ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তথাপি নাবিক বহুদূর নিরীক্ষণ করিয়াও কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন সৈকতভূমিতে অবতরণ করিয়া চারিদিকে বিশেষরূপে সন্ধান করিতে লাগিল। এবার মনোরম যন্ত্রধ্বনিবৎ শব্দ সুস্পষ্ট রূপে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে অধিক-তর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নাবিক ইতস্ততঃ বিশেষ অনুসন্ধান করিতে করিতে অবিলম্বে দেখিতে পাইল সাগর বারি-রাশির অনতিদূরে এক শিলা খণ্ডের উপরে কোনও অদ্ভুত প্রাণী অবস্থিত রহিয়াছে। তাহার মুখাবয়ব মনুষ্যের মুখা-কৃতির কিঞ্চিৎ অনুরূপ; পৃষ্ঠদেশের সহিতও মনুষ্য পৃষ্ঠের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, তথায় হরিদ্বর্ণ কেশ রাশি বিলম্বিত। পুচ্ছ নীল মৎস্যের পুচ্ছ সদৃশ। এই অদৃষ্ট পূর্ব্ব অদ্ভুত পদার্থ দর্শন করিয়া নাবিক প্রথমে অতিশয় ভীত হইল, কিন্তু অচি-

রেই তাহার উপলব্ধি হইল, উহা সামুদ্রিক জীব ভিন্ন আর কিছুই নহে। দুই মিনিট কাল নাবিক তৎপ্রতি স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তৎপর উহা গভীর সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইল। নাবিক অবিলম্বে তাহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট এই গীত-শক্তিশালী মনুষ্যাকৃতি প্রাণীর বিষয় বর্ণনা করিল, এবং তাহার বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন জন্য সমুদ্র-সৈকতে পবিত্র ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল।

কেটলাণ্ড দ্বীপ-শ্রেণীর অন্তর্গত ইয়েল নামক দ্বীপে একদা ধীবরগণ এতজ্জাতীয় আর একটি প্রাণী ধরিয়াছিল। তাঁহাদের পক্ষে যদিও উহার কোনরূপ গীতিধ্বনি শ্রবণ করিবার সুবিধা হয় নাই, তথাপি ধৃত করিবার সময় উহা ক্ষীণ ও কাতরস্বরে আপনার মর্ম্মবেদনা জানাইয়াছিল। ডাক্তার রবার্ট হামিল্‌টন উক্ত প্রাণী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, মৎস্য-জীবিগণ যে অদ্ভুত প্রাণী ধরিয়া ছিল উহা দৈর্ঘ্যে তিন ফিট। মানবদেহের সহিত উহার উপরার্দ্ধের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। ললাট মুখ ও গ্রীবা ক্ষুদ্র, মনুষ্য অপেক্ষা বানর জাতির সহিত ঐ সকল অঙ্গের সাদৃশ্য অধিক। উহার বক্ষঃস্থল স্ত্রীলোকের বক্ষোদেশের ন্যায় উন্নত, হস্তদ্বয় ক্ষুদ্র ও বক্ষপ্রান্তে জড়ান। ছয় জন লোক সম্মিলিত হইয়া উহাকে নৌকায় উত্তোলন করে, কিন্তু ভয় ও কুসংস্কার বশতঃ ধীবরেরা উহাকে পরিপাটীরূপে বন্ধন করিতে পারে নাই; সুতরাং বন্ধন রজ্জুর শিথিলতা জন্য কিয়ৎকাল মধ্যেই উহা মুক্ত হইয়া সমুদ্র জল রাশিতে নিমজ্জিত হইল।

ঈদৃশ অদ্ভুত প্রাণীর অস্তিত্ব বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের

অনেকে অনাস্থা প্রদর্শন করেন। কিন্তু উহাদিগের বিবরণ আরও অনেক স্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ বিগত ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মালয় দেশেও ঈদৃশ একটি প্রাণী ধৃত হইয়াছিল। সিঙ্গাপুরের কোনও সংবাদ পত্রে তদ্‌বিবরণ এইরূপ লিখিত হইয়াছিল। "মালয় দেশীয় এক জন ধীবর সমুদ্রে মৎস্য ধরিতে গিয়া একটি অপূর্ব্ব জন্তু ধরিয়া আনিয়াছে। উহার দৈর্ঘ্য চারি ফীট, মস্তক অনেকাংশে শূকরের মস্তক-সদৃশ। বক্ষঃস্থল এবং পৃষ্ঠদেশ স্ত্রীলোকের বক্ষঃ ও পৃষ্ঠের অনুরূপ। অধোদেশ ক্রমে সরু হইয়া পুচ্ছে পরিণত হইয়াছে। বর্ণ পাশুটে নীল। ডাক্তার ডেনিস্ ইহার সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহারা স্তন্যপায়ী। ধীবরেরা বলে এই প্রাণী অতিশয় সন্তরণ পটু। জলের উপর মস্তক তুলিয়া মনুষ্যের ন্যায় বেগে সাঁতার দিতে পারে।" কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও তদঞ্চলে এই প্রাণী আর একটি ধৃত হইয়াছিল।

যাহা হউক অতঃপর ভরসা করা যাইতে পারে যে, কিয়দংশে মনুষ্যাকৃতির অনুরূপ জলচর প্রাণীর অস্তিত্ব বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা আর সন্দীহান হইবেন না, এবং তাহাদের মনোহর সঙ্গীত শক্তি সম্বন্ধেও উইডেন হামিল্‌টন প্রভৃতি সমুদ্র যাত্রীদিগের বর্ণনায় অবিশ্বাস স্থাপন করিবেন না।

একতা ও সমাজ।

এক জনে সমাজের সৃষ্টি হয় না, একের শক্তিতে সমাজ পরিচালিতও হয় না। ব্যষ্টির সংহতিতেই সমষ্টি, এককের যোগেই দশক। দশ জনের সমষ্টিই সমাজ নাম প্রাপ্ত হয়। অতএব সমাজের ভিত্তিমূল একতার গ্রন্থনেই গ্রথিত। যেমন একতায় সমাজের মূল গ্রথিত, তেমনই একতায়ই সমাজ শক্তির পুষ্টি ও বিকাশ হয় এবং একতার বলেই সমাজ বলীয়ান হয়।

একের শক্তি যদিও অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য কিন্তু দশ জনের শক্তি সমষ্টিত হইলে আর তাহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবহেলা করিবার উপায় নাই। দশের সমষ্টিত শক্তি যখন সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকে তখন কেহই তাহার বেগরোধে সমর্থ হয় না। পর্ব্বতবৎ বিঘ্নরাশি লঙ্ঘন করিয়া, বিপদ রূপিণী তরঙ্গিণী উল্লঙ্ঘন করিয়া উহা অবলীলায় অভীষ্ট পথে চলিয়া যায়।

কেবল মনুষ্য সম্বন্ধেই যে একতার বল এতদূর প্রভাবশালী তাহা নহে। জড় বস্তু ও ইতর প্রাণী সম্বন্ধে বিবেচনা করিলেও একতার গৌরব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। তৃণগুচ্ছ সম্মিলিত করিয়া রজ্জু প্রস্তুত কর, তদ্দ্বারা মত্তহস্তীকেও অনায়াসে বান্ধিয়া রাখিতে পারিবে, কিন্তু এক একটি তৃণ বালকের নখাঘাতেও অবাধে ছিন্ন হইয়া যায়।

পৃথিবী অতি ক্ষুদ্রতম পরমাণু রাশিতে বা স্থূলদৃষ্টিতে বালুকা-

পুঞ্জে নির্ম্মিত; অথচ সেই একীভূত অসংখ্য বালুকা স্তূপ স্বরূপ এই পৃথিবী লইয়া রাজাধিরাজগণও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতেছেন। অপরিমিত ধন রত্ন এবং ঈশ্বরদত্ত অপার্থিব ধন—সংখ্যাতীত মানবের প্রাণ অম্লান চিত্তে সমরানলে আহুতি প্রদান করিতেছেন। অতি সূক্ষ্মতম পরমাণু সমূহের একীভূত শক্তিতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তির উৎপত্তি; যে শক্তিবলে ভূপৃষ্ঠের পর্ব্বত বিচলিত হয় না; সমুদ্র স্থানান্তরিত হয় না; এবং যাহার প্রভাব সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী চন্দ্র সূর্য্যে পর্য্যন্ত উপনীত হইতেছে। এক একটি বৃষ্টিবিন্দু কত ক্ষুদ্র ও সামান্য, কিন্তু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৃষ্টিবিন্দু একত্র হইয়া পৃথিবী প্লাবিত করে, বিস্তীর্ণ নদী গর্ভ পূর্ণ করে, পর্ব্বত-শৃঙ্গ চূর্ণ করে, মত্তহস্তীকে ভাসাইয়া নেয়। মধুমক্ষিকা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, কিন্তু তাহারা ঐক্যবলে বলীয়ান্, কে তাহাদিগকে ভয় না করে? মধুক্রমে লোষ্ট্র নিক্ষেপ কর, সহস্র সহস্র মক্ষিকা তোমাকে আক্রমণ করিবে, জলমগ্ন হইলেও তোমার নিস্তার নাই; কিন্তু একটি মক্ষিকা তোমার কিছুই করিতে সমর্থ হয় না। প্রবালকীটগণ একত্র হইয়া সমুদ্রগর্ভে বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপের সৃষ্টি করে; বীবরগণ সমবেত হইয়া নদীর বেগবান স্রোতঃ বাঁধ বাঁধিয়া ফিরাইয়া দেয়; ক্ষুদ্র পতঙ্গগণ শস্য নষ্ট করিয়া দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে দেশ আচ্ছন্ন করে। সঙ্গে সঙ্গে শত শত লোকের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্যম চির দিনের জন্য নির্ব্বাপিত হয়। অসাধারণ বুদ্ধিবলশালি-মানবমণ্ডলী এই ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের প্রতীপগামী হইতে অসমর্থ হইয়া নীরবে অত্যাচার বহন করে; এবং অত্যাচারিত

হইয়াও একতার মহিমা অনুধ্যান করতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হয়।

একতার নানারূপ প্রকার ভেদ আছে। সভ্যসমাজমাত্রেই একপ্রকার সামাজিক একতা বর্ত্তমান, সে একতা কাহাকেও শিখাইতে হয় না, অথবা তাহার উপকারিতা বুঝাইয়া কাহাকেও সেরূপ একতায় প্রবর্ত্তিত করিতে হয় না। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন সাধন জন্য জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, ঐরূপ একতাসূত্রে পরস্পর আবদ্ধ আছি। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক সকলেই পরস্পরের হিতসাধনে রত রহিয়াছি।

তুমি অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া বস্ত্রবয়ন করিতেছ, তাহাতে শত শত লোকের লজ্জা নিবারিত হইতেছে। আমি মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া হল চালন করিতেছি, তদ্দ্বারা অপরের উদরপূর্ত্তি হইতেছে। আবার আমাদের জন্যও অপরাপর লোকে নানা উপায়ে বিবিধ পদার্থ উৎপাদন ও নির্ম্মান করিতেছে এবং অবিচারিত চিত্তে অপর বিবিধ অভাব বিদূরিত করিতেছে। আমাদিগের জন্য কেহ পাদুকা প্রস্তুত করিতেছে, কেহ বস্ত্র সীবন করিতেছে, কেহ গৃহ নির্ম্মান করিতেছে, কেহ আকরিক উত্তোলন করিতেছে। কেহ তৈজসপত্রাদি প্রস্তুত করিতেছে, কেহ বা বৈদেশিক প্রয়োজনীয় বস্তু দেশে আনিয়া বিবিধ অভাব পরিপূরণ করিতেছে। আবার কেহ আমাদিগের শিক্ষক, কেহ বিচারক, কেহ ধর্ম্মোপদেশক, কেহ শান্তিরক্ষক। এই রূপে প্রত্যেক মনুষ্যই যেন একবাক্য হইয়া সাধারণের অসুখ ও অসুবিধা দূর

করিবার জন্য দিবারাত্র প্রয়াস পাইতেছে। সমাজরূপ বিরাট পুরুষের পরিচর্য্যাই যেন প্রত্যেকের একমাত্র কার্য্য; সকলেই ঐক্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যথাশক্তি সে কর্ত্তব্য সাধন করিতেছে।

একতার আর এক প্রকার ভেদ আছে। সমাজের উপকারার্থ উহারও একান্ত প্রয়োজন। একতা বলিলে সাধারণতঃ তথাবিধ একতাকেই সকলে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাহাকে একতাও বলিতে পারি, একপ্রাণতাও বলিতে পারি। পূর্ব্বে যেরূপ একতার প্রসঙ্গ হইল, একটি ঘটিকা যন্ত্রের কার্য্যকলাপের সহিত তাহার সুন্দর সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইতে পারে। মনুষ্যসমাজ একটি বৃহৎ ঘটিকা যন্ত্র, প্রত্যেক মনুষ্য তাহার এক একটি চক্র। ঘটিকা যন্ত্রের আবরণ উন্মোচন করিলে দৃষ্ট হয়, যন্ত্রের চক্র গুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চালিত হইতেছে অথচ সকল শক্তির সমবায়ে ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা নিয়মিতরূপে আবর্ত্তিত হইতেছে। সমাজ-যন্ত্রও প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সাহায্যে ঐরূপ চালিত হয়। বিভিন্ন পন্থায় বিভিন্ন শক্তি ধাবিত হইতেছে, যেন প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, যেন কেহ কাহারও বাধ্য অথবা কেহ কাহারও বাধক নহে; কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হয় সমস্ত শক্তি-ফল এক স্থানে সমাহৃত হইয়া একটি নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় সাধন করিতেছে। ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় সমাজ যন্ত্রেরও কেন্দ্র স্থলে নানা প্রকার শক্তির বল সমাহৃত হইয়া সমাজপরিচর্য্যারূপ এক উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইতেছে। পরন্তু ঘটিকা যন্ত্রে আরও একটি আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হয়, উহার একটি

চক্রে আঘাত করিলে সমগ্র যন্ত্রটি কম্পিত হয়, একটির কার্য্য রোধ করিলে যন্ত্র উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়।

সমাজ যন্ত্রের চক্র গুলির মধ্যেও এইরূপ একপ্রাণতার একান্ত প্রয়োজন। যে দেশের লোক 'আমি' এবং 'আমরা' এই দুইটি কথার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একতা বা একপ্রাণতার অভাব হওয়া অসম্ভব। 'আমি'—ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, বালুকা কণায় শুষিয়া যায়; আর 'আমরা' বর্ষা কালের প্রলয়কারী বৃষ্টিবিন্দু রাশি, পৃথিবী প্লাবিত করিয়া নদীর ভয়ানকতা বৰ্দ্ধিত করে এবং এক রাজার রাজ্য ভাঙ্গিয়া অন্য রাজাকে উপহার দেয়। অথচ সে প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টি বা বারি-রাশি 'আমি' নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দুর সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমাজের সম্মিলিত চেষ্টা যখন সিদ্ধি লাভে ধাবিত হয় তখন তাহার বল এইরূপ অসাধারণই বটে।

মনুষ্য-দেহের সহিতও মনুষ্য সমাজের একতা বিষয়ে সুন্দর সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইতে পারে। প্রত্যেক মনুষ্য সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ। শরীর রক্ষার জন্য যেমন প্রত্যেক অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, মানব সমাজ যথা-রীতি পরিচালন জন্যও সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যের শক্তি নিয়োগ আবশ্যক। আর, দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেমন পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সহিতও অপরের সেইরূপ দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

দেহের অঙ্গ বিশেষ ছিন্ন হইলে সমস্ত শরীর অবসন্ন ও ব্যথিত হয়। এক অঙ্গের শুশ্রূষা বা সুখ সাধনে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহায়তা করে। যে শরীরের এক অঙ্গের ব্যথায়

অন্য অঙ্গ ব্যথিত না হয়, সে শরীর রুগ্ন। দেহের এক অঙ্গের শুশ্রূষা বা পুষ্টি সাধনে যদি অন্য অঙ্গ সহায়তা না করে, তবে সে অস্বাভাবিক দেহ সত্বর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। উদর পূর্ত্তির জন্য যদি হস্ত অন্নগ্রাস মুখে তুলিয়া না দেয়, মুখ যদি তাহা গ্রহণ না করে, গলনালী তাহা অধঃকৃত না করে তবে যে কেবল উদরেরই ক্ষতি হইবে তাহা নহে, কিন্তু অচিরেই উদর ও সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

মানব সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। সকলে সমাজ পরিচর্য্যায় তৎপর এবং যথোচিত সমবেদন ও এক-প্রাণ না হইলে সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। সমাজস্থ এক ব্যক্তির কষ্টে দশজন ব্যথিত না হইলে, দশের কষ্ট দূর করিতে প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বদ্ধ-পরিকর না হইলে সাধারণের অসুখ ও অসুবিধা নিবারিত হয় না ;—সমাজের উন্নতির জন্য প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ব্যগ্র না হইলে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে না। যে বিপদ আজ তোমাকে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু আমাকে স্পর্শ করে নাই, তাহাতে আমার নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। বিপদের কারণ দূর না হইলে কাল সে বিপদ আমাকেও আক্রমণ করিবে। পরন্তু কেবল আমি তুমি বিপন্ন হইলেও তেমন ক্ষতির বিষয় নহে ; যাহাতে সাধারণের উপাস্য সমাজ রূপ বিরাট পুরুষের উপকার বা অপকার,—যাহাতে দশজনের হিত বা অহিত তৎপ্রতিই আমাদিগকে অধিকতর তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইতে হইবে। কেবল তোমার আমার সুখ দুঃখ সাধারণের সুখ

দুঃখের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর ও অসার জ্ঞান করিতে হইবে ; তুমি আমিই সমাজ নহে।

অপর পক্ষে কেবল 'তুমি' 'আমিই' সমাজ। অসংখ্য 'আমি' 'তুমির' যোগেই বৃহৎ সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি আমি তোমার জন্য কাতর না হই, তুমি আমার বিপদে বিপদ জ্ঞান না কর, তবে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ; তাহা হইলে আর সমাজ থাকে না—আমাদের কোন শক্তিও থাকে না, তখন যৎসামান্য প্রতিকূল-শক্তিই অবাধে আমাদের সমাজ-শরীর দলন করিতে সমর্থ হয়।

ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, অনেক সময়েই সমাজহিত ও আত্মহিত উভয়ে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন যোগে সম্বদ্ধ। সমাজহিতে উপেক্ষা করিয়া কেহই প্রকৃত পক্ষে আত্মহিত সংসাধনে সমর্থ হইতে পারেন না। যদি প্রত্যেকে স্বকীয় সুখ সুবিধায় মুখ্য দৃষ্টি না রাখিয়া সমাজহিতে মনোনিবেশ করেন, তবে তদ্দ্বারা তাঁহাদের স্বকীয় সুখের দ্বারই প্রসারিত হয়। এবং ইহাও প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, যেখানেই দশজনের শক্তি একত্র হইয়া এক উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হয়, সেখানে সফলতা লাভে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থাপিত করিলে তাহারা কিছুই নহে ; কিন্তু তাহাদিগের সম্মিলিত শক্তির প্রভাব অতিশয় দুর্জ্জয় এবং তাহার ক্ষমতা অপার। তখন প্রতিকূল দৈব-শক্তিকেও তাহারা তৃণ জ্ঞান করে।

অতএব তোমার ক্ষমতা সামান্য হইতে পারে, সাধনা বিঘ্ন-শঙ্কুল এবং অনুষ্ঠানও গুরুতর হইতে পারে, কিন্তু বাহু-

দৃশ্যে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ না হইয়া যদি তুমি তোমার সামান্য ক্ষমতা সম্বল করিয়াও বিবেচনা পূর্ব্বক দশজনের সহিত সম্মিলিত হইতে পার, তবে অবাধে অনেক গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। এবং অনেক মহদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিয়া যেমন আপনি ধন্য হইবে, সেইরূপ সংসারেরও মহোপকার সাধনে পারগ হইতে পারিবে। কাঠ বিড়ালও আপনার ক্ষুদ্র শক্তিতে সমুদ্র বন্ধনে সহায় হইয়াছিল।

সূর্য্য-মণ্ডল।

অত্যুজ্জ্বল প্রভাময় সূর্য্য-মণ্ডল মনুষ্য-মনের যাদৃশ বিস্ময়োৎপাদক, সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আর কিছুই তেমন নহে। প্রভাকর সৃষ্টি কর্ত্তার অপার মহিমার জ্বলন্ত চিহ্ন এবং তাঁহার অসীম শক্তির সাক্ষাৎ নিদর্শন। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, সূর্য্য সমভাবে মানব সমাজের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া আসিতেছে।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে নূতন জীবন স্রোতঃ প্রবাহিত হয়, প্রাণিগণ নিদ্রার শীতল ক্রোড় হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দিবসের কার্য্যে মনোনিবেশ করে। অরুণের হৈম-কান্তি পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিলে, পৃথিবীর যে অনির্ব্বচনীয় শোভা ও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কে আনন্দে বিহ্বল না হইয়া থাকিতে পারেন? এক দিকে নিশার ঘোর অন্ধকার তিরোহিত হইয়া পৃথিবী মধু-

আলোকরেখায় অনুরঞ্জিত হয়; অপরদিকে বিহঙ্গমগণ মধুর স্বরে আনন্দ-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে থাকে, গাভীগণ উচ্চৈঃস্বরে রব করিতে আরম্ভ করে, বৎস সমূহ তাহাদের সে প্রীতিকর শব্দের প্রতিধ্বনি করে, অসংখ্য কীট পতঙ্গ ঊষার আলোকে আনন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, পুষ্পকলি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে চারিদিক আমোদিত করে, শীতল সমীরণ অল্পে অল্পে প্রবাহিত হইয়া জীবগণের অপার আনন্দ বিধান করে।

সূর্য্য, ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ; দিন রাত্রি প্রভেদের হেতু; উত্তাপের আকর; সূর্য্য-করে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত না হইলে উহা এমন কঠোর শীতের আবাসস্থল হইত যে, প্রাণী অথবা উদ্ভিদ্ কিছুই সজীব থাকিতে পারিত না। সূর্য্যকরে জল বাষ্পরূপে পরিণত না হইলে মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, কুজ্ঝটিকা কিছুই হইত না; পৃথিবী উৎপাদিকাশক্তি বিহীন এবং ঘোর মরুস্থলীতে পরিণত হইত। সূর্য্য-রশ্মি উদ্ভিদ্ জাতির প্রাণ স্বরূপ; তৎসাহায্যে বীজের আবরণ বিদীর্ণ হইয়া উদ্ভিদ্ অঙ্কুরিত হয় ও ভূপৃষ্ঠ উর্ব্বর হইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে; এবং সূর্য্যকিরণ গ্রহণ করিয়াই উদ্ভিদ্ জীবিত থাকে, ও অধিকাংশ জীব জন্তুর প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহের হেতু হয়।

সৌরকর যে উদ্ভিদ্ এবং প্রাণি-জীবনের প্রধান অবলম্বন ঋতু পরিবর্ত্তনে জীব জন্তু এবং উদ্ভিদ্ পদার্থের বিভিন্ন ভাব পর্য্যালোচনা করিলেই একথা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। শীতান্তে—বসন্তঋতুর আগমনে—যখন সূর্য্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে কর বিতরণ করিতে আরম্ভ করে,

তখন হইতেই প্রকৃতি শিশির কালের মৃতভাব পরিত্যাগ করিয়া নবজীবন লাভ করে। তরুরাজি পুরাতন পত্রের পরিবর্ত্তে নব পল্লবে সুশোভিত হয় এবং ফুল ফলে সজ্জিত হইয়া ভুবন-মোহন রমণীয় কান্তি ধারণ করে; সমুদায় জীব-জন্তু এক অনির্ব্বচনীয় সুখে সুখী হয়; পক্ষিগণ তরুশাখায় উপবেশন করিয়া চতুর্দ্দিকে মধুর সঙ্গীত-লহরী বিস্তার করে; এবং মনুষ্যেরও দেহ মন উৎফুল্ল হইয়া অভূতপূর্ব্ব সুখের তরঙ্গে ভাসিতে থাকে। কিন্তু শীতকালে, যখন সূর্য্যকিরণ পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে বিকীর্ণ হয়, তখন প্রকৃতির সম্পূর্ণ ভিন্নভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দুঃসহ শীত আসিয়া পৃথিবীকে গ্রাস করে, অধিকাংশ তরুলতা হীনপত্র ও নিস্তেজ হইয়া যায়, মনুষ্যদিগের শরীর মন সঙ্কুচিত ও জড়ীভূত হয়, জীব জন্তু আর আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়ায় না, বিহগকুল মনের আনন্দে বসন্ত সঙ্গীত গায় না।

আমরা নানাবিধ সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হই; সূর্য্যই তাহার মূল। দর্শন ব্যাপারে দিবাকরের সহায়তা না পাইলে আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ; সূর্য্যালোকের সাহায্যেই পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। আর রজনীতে ভূমণ্ডল যে মৃদু আলোকে আলোকিত হয় তাহারও মূল কারণ সূর্য্যালোক। সূর্য্যের চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী গ্রহ মণ্ডলী এবং মনোহর চন্দ্রমা নিজে জ্যোতির্ম্ময় নহে, সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হইয়াই তাহারা জ্যোতিষ্মান্ হয়, এবং চতুর্দ্দিকে শোভা বিকাশ করে। পরন্তু সূর্য্য যে কেবল আলোক দান করিয়া পদার্থ দর্শনের সাহায্য করে তাহাও নহে;

যে গুণে পদার্থ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, সে গুণও সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত। আমরা বর্ণ দ্বারাই বস্তুর আকার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি; সূর্য্যরশ্মি সেই বর্ণের উৎপাদক। সূর্য্যকিরণে নীল, পীত, লোহিত এই তিনটি মূলবর্ণ এবং হরিত পাটলাদি চারিটি মিশ্রবর্ণ বর্ত্তমান আছে। * বৃষ্টিকালীন জলকণাসমূহে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া তাহা হইতে এক প্রকার বক্র গতিতে চালিত হইয়া আসিলে সূর্য্য-রশ্মির সেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ রামধনুর আকারে বিভিন্ন ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্য্যরশ্মির সেই সকল বর্ণের সাহায্যেই অসংখ্য মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হয় এবং ভূমণ্ডলের যাবতীয় পদার্থও তৎসাহায্যেই অনুরঞ্জিত হয়। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে বস্তু হইতে সূর্য্য-রশ্মির যে বর্ণের আলোক-রেখা প্রতিহত অথবা যাহার মধ্য দিয়া যে বর্ণের আলোক সঞ্চালিত হয়, সে বস্তুর সেই বর্ণ নয়নগোচর হইয়া থাকে। অতএব সূর্য্যই এই বিচিত্র

---

* আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের মত যে, নীল, পীত ও লোহিত এই তিনটির মধ্যে নীল ও পীত মূলবর্ণ নহে। হরিৎ লোহিত ও ভায়োলেট এই তিনটিই মূলবর্ণ, আর সমস্তই মিশ্রবর্ণ। আমরা বিভিন্ন বর্ণের পদার্থ মিশ্রিতকরিয়া মনে করি যে, বিভিন্ন বর্ণ মিশ্রিত করিলাম। কিন্তু বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ মিশ্রিত করিলেই যে, বর্ণ মিশ্রিত করা হয় এমন নহে। কি কি বর্ণ মিশ্রিত করিলে কি প্রকার মিশ্রবর্ণ উৎপন্ন হয় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইলে সেই সেই বর্ণোৎপাদক আলোক মিশ্রিত করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোক লইয়া নানারূপে পরীক্ষা করিয়াই উক্ত পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেন যে, নীল ও পীত মূলবর্ণ নহে। লোহিত, হরিৎ এবং ভায়োলেটই মূলবর্ণ।

পৃথিবীর একমাত্র চিত্রকর। আমরা সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রীত হই, কিন্তু দিনমণির শিল্পচাতুর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের প্রধান অংশের উৎপত্তি, ইহা কখন কল্পনাও করি না।

যাঁহারা সূর্য্যমণ্ডলকে এক খণ্ড স্বর্ণ থালার ন্যায় বিবেচনা করেন, তাঁহারা ইহার আকৃতি ও আয়তনের বিষয় শ্রবণ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন। সার্ জন্ হর্শেল নামক জনৈক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের গণনা অনুসারে সূর্য্যের ব্যাস প্রায় ৮,৮২০০০ মাইল; এবং পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য প্রায় ১৩, ৩১,০০০ গুণ বৃহৎ, অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর ন্যায় ১৩ লক্ষটি পৃথিবী সূর্য্যের গর্ভে অনায়াসে পূরিয়া রাখা যাইতে পারে।

সূর্য্যের দূরতাও সামান্য নহে; আধুনিক পণ্ডিত মণ্ডলির মতে সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯,২০,০০,০০০ মাইল দূরবর্ত্তী। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরতা যত, সূর্য্যের দূরতা তাহা অপেক্ষা প্রায় ৪০০ গুণ অধিক। যে রেলওয়ে শকট প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ধাবিত হয়, অহোরাত্র অবিশ্রান্ত চলিলে ভূপৃষ্ঠ হইতে সূর্য্য-মণ্ডলে উপনীত হইতে তাহারও ৩৬০ বৎসর অপেক্ষা অধিক সময় লাগিবে; অথচ পৃথিবীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আসিতে তাহার ৩৫ দিনেরও প্রয়োজন হয় না। যে কামানের গোলা প্রতি মিনিটে ৮ মাইল বেগে চলিয়া যায়, অবিশ্রান্ত চলিয়া তাহার সূর্য্যমণ্ডল স্পর্শ করিতে দ্বাবিংশ বৎসর অপেক্ষাও অধিক সময়ের আবশ্যক হইবে।

কোন প্রধান পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এক স্থানে যুগপৎ ৫৫৬০টি মোমবাতি প্রজ্বালিত হইলে তাহার এক ফুট

অন্তরে যে পরিমাণ আলোক প্রকাশিত হয়, পৃথিবীতে সরল-ভাবে পতিত সূর্য্যালোক সেই পরিমাণ উজ্জ্বল ; এবং চন্দ্রা-লোক হইতে সৌর-করের ঔজ্জ্বল্য প্রায় তিন লক্ষ গুণ অধিক।

উপরোক্ত সার্ জন্ হর্শেল্ নামক সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত বলেন, সূর্য্য-শরীর প্রকৃত পক্ষে দীপ্তিময় নহে,এক প্রকার প্রদীপ্ত তরল পদার্থে সূর্য্যের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত, আমরা সূর্য্যের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী সেই জ্যোতির্ম্ময় আবরণই দেখিয়া থাকি ; ঐ বাষ্পীয় আবরণ হইতেই চতুর্দ্দিকে আলোক বিকীর্ণ হয়। আবার ঐ জ্যোতির্ম্ময় আবরণের অভ্যন্তরে বাষ্প-বৎ পদার্থের আরও একটি আবরণ বর্ত্তমান আছে বলিয়া অনু-মিত হইয়াছে, তৎপর জ্যোতিঃশূন্য সূর্য্য-দেহ। পৃথিবীতে যেমন মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড বায়ুস্রোতঃ প্রবাহিত হয়, সূর্য্য-মণ্ডলেও সেই রূপ প্রচণ্ড সৌরবাত্যা সকল উৎপন্ন হইয়া উপরিভাগের বাষ্পসদৃশ উজ্জ্বল পদার্থ রাশিকে সময়ে সময়ে বিচলিত করে। এইরূপে জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পীয় আবরণের কোন কোন স্থান বিচ্ছিন্ন হওয়াতে মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণবর্ণ সূর্য্যদেহ বৃহৎ বৃহৎ কৃষ্ণচিহ্নের আকারে পরিলক্ষিত হয় ; আবার উপযুক্ত সময়ে ঐ সকল শূন্যস্থান পূর্ণ হইলে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন-গুলিও বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরন্তু ঐ সকল চিহ্ন একস্থান হইতে স্থানান্তরে চালিত হইয়াও ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যায়। কতকগুলি কৃষ্ণচিহ্ন সূর্য্যমণ্ডলে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সময়ে সময়ে তাহাদেরও সংস্থান ও আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে। উৎকৃষ্ট দূরবীক্ষণ

যন্ত্র যোগে সূর্য্যদেহের ঐ সকল পরিবর্ত্তন বিলক্ষণ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত উজ্জ্বল বাষ্পীয় আবরণের উপরিভাগে আরও একটি অর্দ্ধস্বচ্ছ সুবৃহৎ বায়বীয় আবরণ দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত; ইহাকে পণ্ডিতেরা 'সৌর-বায়ু মণ্ডল' নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

সূর্য্য-দেহ কৃষ্ণবর্ণ বলা হইল, কিন্তু উহার বর্ণ যত দূর গভীর কৃষ্ণ অনুভূত হয় উহা প্রকৃত পক্ষে তেমন নহে। অত্যুজ্জ্বল আবরণের ভিতর দিয়া দৃষ্ট হয় বলিয়াই, বর্ণ গভীর কৃষ্ণ অনুভূত হইয়া থাকে। বুধ অথবা শুক্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হইলে যখন উহারা সূর্য্যমণ্ডলের উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন দূরবীক্ষণ সাহায্যে সূর্য্যমণ্ডলে ঐ বুধ ও শুক্রকে কৃষ্ণ বর্ণ বিন্দুর ন্যায় দৃষ্ট হয়। ঐ কৃষ্ণবিন্দু যখন সূর্য্যমণ্ডলস্থ কৃষ্ণ চিহ্ন গুলির উপর দিয়া গমন করে তখন তাহাদিগকে অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ অনুভূত হয়। গ্রহ মণ্ডলী সূর্য্যালোকে আলোকময় হইয়াই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। যে জ্যোতিষ্ক যখন সূর্য্যের নিম্নে ও পৃথিবীর উপরে থাকিবে তখন তাহা পৃথিবী হইতে দৃষ্ট হইবে না। অমাবস্যা রজনীতে পৃথিবী যেমন অন্ধকারময়ী, ঐ জ্যোতিষ্কগুলিও সূর্য্য কিরণাভাবে সেইরূপ অন্ধকারাবৃত থাকে। এ জন্যই বুধ ও শুক্র যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থান করে তখন আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না; কিন্তু ঘুরিতে ঘুরিতে উজ্জ্বল সূর্য্যমণ্ডলের নিম্ন দেশে আগমন করিলে দূরবীক্ষণ সাহায্যে উহাদিগকে কৃষ্ণবিন্দুর আকারে স্পষ্ট দেখিতে পাই। যদি সহজ-

চক্ষে দৃষ্ট হইত তবে উহাও এক প্রকার সূর্য্য গ্রহণ বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিতাম। ফলে, চন্দ্র দ্বারা যে সূর্য্য গ্রহণ হয়, তাহার সহিত এই গ্রহ ঘটিত সূর্য্যগ্রহণের কারণগত কোনও প্রভেদ নাই। যাহাহউক ঐ গ্রহগুলি যখন সূর্য্যের কৃষ্ণচিহ্নগুলির উপর দিয়া চলিয়া যাইতে থাকে, তদবস্থায় সূর্য্যমণ্ডলীয় কৃষ্ণচিহ্নের মধ্যেও উহাদিগকে স্বতন্ত্র কৃষ্ণ বিন্দুর আকারে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কৃষ্ণবিন্দু সূর্য্য-দেহস্থিত কৃষ্ণচিহ্ন অপেক্ষা অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ। অতএব একথা স্পষ্টই বোধগম্য হইতেছে যে, অমাবস্যা রজনীতে আমাদিগের পৃথিবী যতদূর কৃষ্ণবর্ণ হয়, অর্থাৎ সূর্য্যালোক বিরহে গ্রহ উপগ্রহাদি যতদূর কৃষ্ণবর্ণ থাকে, সূর্য্যদেহস্থিত কৃষ্ণচিহ্ন গুলি ততদূর অন্ধকারাবৃতও নহে। অতএব জ্যোতির্ম্ময় আবরণের অভ্যন্তরস্থিত সূর্য্য-দেহ যে গভীর কৃষ্ণবর্ণ নহে অপেক্ষাকৃত আলোকময় ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

সূর্য্য মণ্ডলীয় কৃষ্ণ চিহ্নগুলির একটি স্বভাব অতি অদ্ভুত; ঐ সকল চিহ্ন সর্ব্বদা সমান থাকে না, কখন অত্যন্ত অধিক, কখন বা অতি অল্প দৃষ্ট হয়। এই পরিবর্ত্তন অল্পে অল্পে সংঘটিত হয় এবং তাহা একটি সুন্দর শৃঙ্খলার অধীন। মনে কর, বর্ত্তমান সময়ে যেন ঐ সকল চিহ্নের অত্যন্ত আধিক্য হইয়াছে; এখন হইতে যতই দিন অতীত হইতে থাকিবে, দিনে দিনে ঐ সকল চিহ্নেরও ততই অল্পতা হইতে থাকিবে, এবং পাঁচ বৎসর পরে উহা অত্যন্ত অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হইবে। আবার তাহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে আধিক্য হইয়া আর

পাঁচ বৎসর অন্তে পুনরায় বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় অত্যন্ত অধিক হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপে স্থূলতঃ প্রতি একাদশ বৎসরে ঐ সকল চিহ্ন এক একবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে।

সূর্য্যমণ্ডলের ঈদৃশ পরিবর্ত্তনে পৃথিবীর কোন রূপ প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় কিনা তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন। এবং তাঁহারা এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যখন সূর্য্যে ঐ সকল কৃষ্ণ চিহ্ন অত্যন্ত অধিক দৃষ্ট হয়, তখন চুম্বক ও তাড়িতের ক্রিয়ার কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটে, এবং মেরু সন্নিহিত-প্রদেশে যে 'আরোরা' নামে এক প্রকার বৈদ্যুতিক আলো অন্তরীক্ষে বিদ্যমান তাহার দীপ্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। বিশেষতঃ সম্প্রতি ইহাও এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যে বৎসর ঐ সকল চিহ্ন অত্যধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, সে বার ঝড় বৃষ্টির উপদ্রবের আধিক্য হইয়া থাকে। এবং ক্রমে ঐ সকল চিহ্নের অল্পতার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল প্রাকৃতিক ক্রিয়ারও অল্পতা সংঘটিত হয়। *

হর্শেল সাহেব আরও বলেন;—দিবা দ্বিপ্রহর কালে পৃথিবীর গ্রীষ্ম-মণ্ডলস্থিত প্রদেশ সমূহ সরলভাবে পতিত সূর্য্যকিরণ দ্বারা যত উষ্ণ হয়, সূর্য্যদেহ তদপেক্ষা ৯০,০০০ নবতিসহস্র গুণে অধিক উত্তপ্ত। উত্তম আতসী কাচ দ্বারা যে তাপ সংগৃহীত হয় তাহা অগ্নির উত্তাপ অপেক্ষা বহুগুণে

* বিগত ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে ঐ সকল কৃষ্ণ চিহ্নের অত্যন্ত আধিক্য হইয়াছিল। সে বার ঝড় বাত্যার উপদ্রবও অধিক হইয়াছিল। ১৮৮৭ সালে ঐ চিহ্ন গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইবার কথা।

অধিক ; অত্যুৎকৃষ্ট আতসী কাচ যোগে এত গুরুতর তাপের উদ্ভব হয় যে, তৎসাহায্যে লৌহ প্লাটিনাম্ প্রভৃতি কঠিন ধাতু-দ্রব্য সকলও অল্পকাল মধ্যে দ্রব হইয়া যায়। কিন্তু সূর্য্য-দেহের উষ্ণতা তদপেক্ষাও বহুগুণে অধিক। পৃথিবীতে এমন কঠিন পদার্থ কিছুই নাই যাহা সূর্য্যমণ্ডলে নীত হইলে কঠিন অবস্থায় তিষ্ঠিতে পারে। পৃথিবীর যাদৃশ কঠিন পদার্থই কেন হউক না, সূর্য্যে নিলে তৎক্ষণাৎ তরল ও বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া যাইবে।

সূর্য্যকিরণ বায়ুরাশি ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আইসে, কিন্তু তদ্দ্বারা বায়ুরাশি বড় অধিক উত্তপ্ত হয় না। সূর্য্য-তাপে পৃথিবী বিলক্ষণ উত্তপ্ত হয়, পৃথিবীর সেই উত্তাপ বিকীর্ণ ও চারিদিকে চালিত হওয়াতেই বায়ুরাশি উত্তপ্ত হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে সঞ্চালিত উক্ত উত্তাপ দূরতা অনুসারে ক্রমেই মৃদু হয়, এজন্যই নীচের বায়ু অপেক্ষা উপরের বায়ু শীতল এবং এই কারণেই অত্যুচ্চ পর্ব্বত গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও তাহার শিখরদেশ চির-বরফে মণ্ডিত থাকে। কোন কোন পণ্ডিত এরূপও বলেন যে, আমরা সূর্য্যকে যাদৃশ খরতর তাপের আধার বলিয়া মনে করি, ইহা বাস্তবিক তেমন নহে। সূর্য্য হইতে যে কিরণ-স্রোতঃ পৃথিবীতে আইসে, তাহা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বায়ুরাশি ভেদ করিয়া আসিবার সময় পার্থিব-বায়ুর সহযোগেই ঈদৃশ তেজোময় হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, সৌরকর পার্থিব বায়ুর যোগে উত্তপ্ত হয় বলিয়াই অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ অথবা ভূমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্থিত বায়ুমণ্ডল এত শীতল ; কারণ সূর্য্য-

কিরণ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ বায়ুরাশি ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় অধুনাতন পণ্ডিত সমাজ এ মত ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা সূর্য্যকে প্রত্যহ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম গগনে চলিয়া যাইতে দেখি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা সূর্য্যের গতি নহে। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর দিবসে একবার আবর্ত্তিত হয়, তাহাতেই সূর্য্যমণ্ডল সচল বোধ হয়। বস্তুতঃ পৃথিবী সম্বন্ধে সূর্য্যকে সম্পূর্ণ স্থির বলা যাইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সূর্য্যও স্থির নহে। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় ইহারও আহ্নিক ও বার্ষিক গতি আছে। পৃথিবী যেমন এক দিবারাত্রের মধ্যে একবার আপনা আপনি আবর্ত্তিত হয়, সূর্য্যও সেই রূপ প্রচণ্ডবেগে আমাদিগের ২৫ দিবস ৭ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট সময় মধ্যে একবার আপনা আপনি আবর্ত্তিত হয়; এবং পৃথিবী যেমন এক বৎসরে এক বার সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করে, সূর্য্য মণ্ডলও সেইরূপ যাবতীয় সৌরগ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু প্রভৃতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া বহুদিবসে হয়ত কোন সুদূরবর্ত্তী অতি বৃহৎ জ্যোতিষ্কের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।*

চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, পৃথিবী আবার চন্দ্রমণ্ডলের সহিত কিঞ্চিদধিক তিন শত পঞ্চষষ্টি দিবসে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে; এবং অন্যান্য গ্রহগণও এইরূপে সূর্য্যের সহিত দুশ্ছেদ্য আকর্ষণে আবদ্ধ

---

* অনেকে অনুমান করেন সূর্য্য সপ্তর্ষি মণ্ডলের অন্তর্গত একটি নক্ষত্রকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিবেষ্টন করিতেছে।

থাকিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহারা গ্রহ, এবং যাহারা গ্রহগণের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে তাহারা উপগ্রহ বা চন্দ্র; সূর্য্য এবং তাহার চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী এই সমুদয় গ্রহ উপগ্রহাদির সমষ্টির নাম সৌর-জগৎ।

আমাদের সৌরজগতের ন্যায় অনন্ত আকাশে আরও কত কোটি কোটি সংখ্যক সৌরজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সহজ চক্ষে, অথবা দূরবীক্ষণ যোগে আকাশে যে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার মধ্যে কয়েকটি মাত্র গ্রহ, এবং আমাদের সৌরজগতের অন্তর্ভূত। অপর গুলি গ্রহ নহে, সেই সকল নক্ষত্র এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্য সদৃশ; এবং হয়ত প্রত্যেকেই এক এক সুবিশাল সৌরজগতের কেন্দ্র ও অবলম্বন। তাহারাও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্কর আলোকময় ও অচিন্ত্য প্রভাবশালী। তাহারাও প্রত্যেকেই আপন আপন অধীনস্থ যাবতীয় গ্রহ ও উপগ্রহমণ্ডলীর সমভিব্যাহারে অপর কোন সুবৃহৎ নক্ষত্রের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতেছে, অথবা তুল্য ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন নক্ষত্রের সহিত সম আকর্ষণে আবদ্ধ থাকিয়া উভয়ে পরস্পরের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে। এইরূপে কত শত শত কোটি সৌরমণ্ডল অনন্ত অকাশে অসাধারণ দ্রুত গতিতে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। অথচ তাহাদের শৃঙ্খলা কেমন অদ্ভুত; তাহারা কখনও একে অন্যের গতি বা ক্রিয়ার কোনও প্রতিবন্ধকতা না জন্মাইয়া একই ভাবে চিরকাল চলিয়া

আসিতেছে। যিনি অনন্ত আকাশে অসংখ্য সৌরজগতের সৃষ্টি করিয়া এক শৃঙ্খলা ও এক নিয়মে সমুদয়কে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি ও বিচিত্র মহিমা ধন্য।

বর্ত্তমান কাল।

বর্ত্তমান অতীতের ফল এবং ভবিষ্যতের সাক্ষী। অতীত-জীবন যিনি যে ভাবে গত করিয়াছেন বর্ত্তমানে তিনি সেই রূপ ফলভোগ করিতেছেন। যে দেশের অথবা যে জাতির অতীতকাল যে ভাবে বিগত হইয়াছে বর্ত্তমানে তাহারও তদনুসারে উন্নতি বা দুর্গতি, সম্পদ বা বিপদ সংঘটিত হইতেছে। যাবতীয় অতীত ঘটনার সমষ্টিত-শক্তি বর্ত্তমানে বল প্রকাশ করিতেছে। অতীতকালের পণ্ডিতগণ যে সকল অমূল্য তত্ত্ব-রত্ন আবিষ্কার করিয়াছেন, বর্ত্তমানে আমরা সেই সকল সম্পদেই সম্পন্ন হইয়াছি। পূর্ব্বতন মানবগণ প্রকৃতির অপরিহার্য্য মহাসমরে যে সকল বিজয় লাভ করিয়াছিলেন সেই সমস্ত জয়চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াই আমরা বর্ত্তমানের সুখময় রাজ্যে উপনীত হইয়াছি। তাঁহাদিগের প্রতি পদস্খলন আমাদের উন্নতির বাধক এবং প্রত্যেক কৃতকার্য্যতা উন্নতির সহায় হইয়াছে। এমন কি, আদিম পদস্খলনও পরবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর উন্নতির কারণ বলিয়াই গণ্য হয়। রাজ বিপ্লব বল, ধর্ম্ম বিপ্লব বল, সমাজ বিপ্লব বল অথবা প্রত্যেক মানবের জীবনগত মহাবিপ্লব বল অতীতের কোনও কর্ম্মফল বর্ত্তমানে বিলোপ

প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব বলিতেছি,—বর্ত্তমান কালে অনন্ত অতীত কালের ফল প্রসূত হইতেছে।

বর্ত্তমান ভবিষ্যতের সাক্ষী। ব্যক্তি বিশেষের অথবা জাতি বিশেষের ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপে অতিবাহিত হইবে বর্ত্তমানের ক্রিয়া কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহা নির্ণীত হয়। অসংখ্য মহা বিপ্লবের বীজ বর্ত্তমানের কর্ষিত ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ও গোপনে রোপিত হইতেছে। সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র ঘটনার অগণিত বীজও উক্ত মৃত্তিকাতেই নিহিত হইতেছে। জীবনের কত পাপ, কত পুণ্য, কত হর্ষ, কত বিষাদ, কত সম্পদ কত বিপদ, কত জয়, কত পরাজয়ের অব্যর্থ বীজ বর্ত্তমানের উর্ব্বর মৃত্তিকায় রোপিত হইতেছে। গৌণে অথবা অগৌণে সেই সকল বীজ অঙ্কুরিত হইবে, এবং তাহা হইতে মধুর কিম্বা বিষাক্ত যেরূপ ফলই প্রসূত হউক তাহাই ভবিষ্যতের উপজীব্য হইবে। এ জন্যই পণ্ডিতেরা বলেন,—বর্ত্তমান বীজ বপনের সময়, ভবিষ্যৎ ফলভোগের কাল। অতএব বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের সাক্ষী ব্যতীত আর কি বলিব?

বর্ত্তমান কাল মানব-সমাজের উন্নতির প্রধান সহায়। প্রতি বৎসর পৃথিবী উন্নতির পথে তিল তিল করিয়া অগ্রসর হইতেছে, দিনে দিনে নানা অজ্ঞাত তত্ত্বের আবিষ্কার হইতেছে, বিবিধ অপরিজ্ঞাত নীতির উদ্ভাবন হইতেছে, ক্রমে কুসংস্কারের কুহেলিকা অন্তরিত হইয়া সত্য সূর্য্য প্রকাশিত হইতেছে। ব্যষ্টিগত অথবা সমষ্টিগত শক্তির প্রভাবে সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা ও আপদ বিপদের হেতু [illegible] তিরোহিত হইতেছে। চরম উন্নতির [illegible] [illegible]

প্রভাবে দিনে দিনে মানব সমাজ তাহার অভিমুখী হইতেছে। পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে যে জাতি উন্নতির যে সোপানে অবস্থিত ছিল বর্ত্তমানে তদপেক্ষা ঊর্দ্ধগামী হইয়াছে, আরও পঞ্চ-শত বর্ষ অতীত হইলে আরও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে, এ জন্যই সময়কে মানব সমাজের উন্নতির সহায় বলা গিয়া থাকে।

কিন্তু জাতি ও দেশভেদে উন্নতির এই ঊর্দ্ধগতির বিপর্য্যয় হইতেও দেখা যায়। বর্ত্তমান কালের অপব্যবহারে অথবা কঠোর সাময়িক ঘটনার প্রভাবে ক্রমোন্নতির গতি প্রত্যাহত হয়। ভারতবর্ষে এইরূপে উন্নতির বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। এ দেশের প্রাচীন উন্নতি অব্যাহত ভাবে ক্রমবিকা-শিত হইলে বর্ত্তমানে আমাদের অবস্থা অন্যরূপ হইত। তাহা হইলে বর্ত্তমানকালে পৃথিবীতে উন্নতির বাজারে আমাদিগের প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইবার লোক অল্পই থাকিত। কিন্তু কালের কঠোর শাসনে আমরা সে-সম্পদের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমমাংস-ভোজী, বল্কল-ধারী, বৃক্ষ-কোটর বাসী, তদানীন্তন বর্ব্বর জাতীয়গণ বর্ত্তমানে যে উন্নতি ও সম্পদের অধিকারী, আমরা তাহা হইতেও বহু দূরে অব-স্থিত রহিয়াছি। বর্ত্তমান ইউরোপীয়গণ আমাদিগের আদর্শ, অধিপতি এবং অনেক বিষয়ে পরিচালক; কিন্তু ভারতের প্রচুর উন্নতির সময়ে সেই ইয়োরোপের দুই একটি দেশ উন্নতির বাল্য লীলা প্রদর্শন করিতেছিল মাত্র।

বর্ত্তমান অতীতের ফল বলিয়াই যখন আমরা বর্ত্তমা-নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তখন অতীতের যুগযুগান্তের স্মর-ণীয় ঘটনায় দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কত সুখের কথায় চিত্ত উৎফুল্ল

হয়, কত দুঃখের ঘটনায় মন আলোড়িত হয়। কিন্তু অতীতের ধারাবাহিক বিবরণ সমালোচন সহজ ব্যাপার নহে।

জগতের ইতিহাস দূরে থাকুক, যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের আত্ম-জীবনের অতীত ইতিহাস বর্ণনায় ব্যাপৃত হই তবেও নানা সুখ দুঃখ সমন্বিত, উত্থান পতনের বিবিধ চিত্র সংযুক্ত এক এক খানি বিস্তৃত গ্রন্থের অবতারণা হয়। ঐ রূপ অতীত চিন্তার ফলও যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহাও নহে। যখন আমরা সেই সুখ দুঃখ জয় পরাজয়ের স্মৃতি ধীরভাবে আন্দোলন করি, তখন বৰ্ত্তমানের গন্তব্য পথে একটি সুন্দর আলোক প্রাপ্ত হই। সে আলোক আলেয়ার জ্যোতির ন্যায় ভ্রান্তি-বিধায়ক নহে, তৎসাহায্যে আমরা গন্তব্য পথের বিঘ্ন বিপত্তি অনেক সময়ে পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাই। কিন্তু অতীত সুখ দুঃখাদির চিন্তায় যদি আমরা বৰ্ত্তমানের উপর অবহেলা করিতে শিক্ষা করি তাহা হইলে কদাচ ইষ্ট ফল লাভে সমর্থ হইতে পারি না।

ইহা প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, ভূত এবং ভবিষ্যৎ কাল অপেক্ষা বৰ্ত্তমান কাল বহুগুণে মূল্যবান্। অতীত সুখের মনোহর চিত্রপট অথবা দুঃখের তমোময় দৃশ্য স্মৃতি-পথে উপনীত হইয়া অনেক সময় সুখ দুঃখের কারণ হয় বটে, কিন্তু সেই সকল সুখ দুঃখের স্রোতে পড়িয়া বৰ্ত্তমান কালকে অবহেলা করিলে মনুষ্যের দুর্গতির অবধি থাকে না। সেই সুখ দুঃখের স্মৃতি ব্যক্তিবিশেষের ও জাতিবিশেষের পথ-প্রদর্শক হইবে মাত্র, কিন্তু গন্তব্য পথের মুখ্য সঙ্গী যেন কদাচ না হয়। আবার ভবিষ্যতেরও সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ বা

ফলাফলের চিন্তায় নিমগ্ন থাকা মঙ্গলেচ্ছুর পক্ষে বিধেয় নহে। যাহারা বর্ত্তমান ভুলিয়া সর্ব্ব বিষয়ে ভবিষ্যতে নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হয় তাহারা কেবল মাত্র চির অন্ধকার ময়ী রজনীতে বৃথায় ঘুরিয়া বেড়ায়, ঈপ্সিত ফল লাভে কদাচ সমর্থ হয় না। অতএব আপন জীবন মঙ্গলময় করিতে যাহারা অভিলাষী তাহাদিগকে বর্ত্তমান কালের উপরেই সর্ব্বথা নির্ভর করিতে হইবে। বর্ত্তমান কালকে বৃথা কাজে অপ-চয় করিলে, বর্ত্তমানে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের বীজ রোপণ না করিলে কেহই মূল্যবান জীবনের অধিকারী হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালকে সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে। ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানের প্রত্যক মুহূর্ত্তকে কার্য্যের বন্ধনে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তই যেন ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কারণ হইতে পারে, প্রত্যেক মূহূর্ত্তকেই যেন আমরা ভবিষ্যতে গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে সমর্থ হই। এরূপ উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া যদি আমরা বর্ত্তমান কাল অতিবাহিত করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকি তাহা হইলে জীবনে ঈদৃশ অসংখ্য শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইবেই হইবে যাহাদিগকে সত্য সত্যই চিরকাল গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে সমর্থ হইব।

পৃথিবীর বর্ত্তমানের উন্নতি যেন আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে না পারে। বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ কিরূপ উন্নতির স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। অতীত ও বর্ত্ত-মানের বিবিধ তত্ত্বে অভিজ্ঞ হইতে হইবে এবং নানা প্রকার উন্নতির ও অবনতির কারণ অবগত হইয়া গুণের ভাগ গ্রহণ

করিতে হইবে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত অবনতির কারণ পরিহার করিয়া উন্নতির পথে অব্যাহত বেগে অগ্রসর হইতে হইবে।

এইরূপে যদি তোমরা বর্ত্তমানকালের মূল্য যথার্থ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারগ হও, তবেই জীবনের সংগ্রামে প্রশংসিতরূপে জয়ী হইতে পারিবে। তোমাদের বাল্যের বাসনা যৌবনে পরিপূরিত হইবে, যৌবনের অভিলাষ বার্দ্ধক্যে সফল হইবে এবং সুখে সৌভাগ্যে ও মঙ্গলসহকারে ভবিষ্যৎকাল অতিবাহিত করিতে পারিবে। তাহা হইলেই তোমরা সময়-রূপ মহাপ্রান্তরে এরূপ পদচিহ্ন বিন্যাস করিয়া যাইতে পারিবে যে, যুগের পর যুগ অতীত হইলেও তাহার বিলোপ হইবে না এবং সেই উজ্জ্বল পন্থা লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অপর মানবগণ সিদ্ধির মন্দিরে উপনীত হইতে সমর্থ হইবে।

প্রাচীন ভারতের কয়েকটি কথা।

পূর্ব্বতন আর্য্য মনীষিগণ নানা বিষয়িণী বিদ্যায় অতিশয় গৌরব জনক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক তত্ত্ব সঙ্কলনে তাঁহাদিগকে নিতান্ত উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পার্থিব জয় পরাজয়ের—ব্যক্তি বিশেষের বা জাতিবিশেষের ইহ জীবনের উত্থান পতনের সামান্য বিষয় তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে অতিশয় অসার প্রতীত হইত। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর বিষয়ের চর্চ্চায় নিবিষ্ট থাকি-

তেই ভালবাসিতেন। ভিন্ন ভিন্ন রাজ সংসারে, এবং ক্বচিৎ কোন জ্ঞানিব্যক্তির প্রতিভাবলে ইতিহাসের যাহা কিছু সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহারও প্রায় সমস্তই সর্ব্বসংহারি কালের পরাক্রমে, পাঠকের অনাদরে এবং বৈদেশিক আক্রমণাদির ঝঞ্ঝাবায়ুতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি সমগ্র ভারতীয় গ্রন্থরাশির মধ্যে দুই একখানি প্রকৃত ইতিহাসের নামোল্লেখ করিতে পারা যায় কি না তাহাতেও সন্দেহ।

প্রাচীন আর্য্যসমাজের ঐতিহাসিক-সত্য পৌরাণিক অতিবর্ণনার কুহেলিকায় এবং কবিকল্পনার ঘন-ঘটায় নিবিড় আচ্ছন্ন। কিন্তু সেই তমোরাশির মধ্য দিয়াই আমাদিগকে সত্যের জ্যোতিকণা সমূহ দর্শন করিতে হয়। রামায়ণ মহাভারতাদি পৌরাণিক কাব্যে তদানীন্তনকালের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত প্রকৃত ইতিহাস না হইলেও সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বর্গের শাসন কালীন আর্য্যসমাজের দীর্ঘ কালের ইতিবৃত্ত উহাতে পরিস্ফুট রূপে দেদিপ্যমান আছে। ইতিহাসের কঙ্কালময় দেহের উপরে কবিপ্রতিভা প্রয়োজনীয় রক্তমাংসের যোজনা করতঃ কল্পনার বস্ত্রালঙ্কারে তাহা সজ্জিত করিয়া এক অনুপম সৃষ্টিতে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে।

সমাজের অনুন্নত বাল্যাবস্থায় কেবল ইতিহাস কেন, কোন প্রকার শাস্ত্রেরই অবতারণা হয় না। সমাজ উন্নতিশৈলের উপরে বহুদূর অধিরোহণ না করিলে শাস্ত্রাদি প্রণীত হইতে পারে না। কাব্যগ্রন্থ অপেক্ষা বিজ্ঞান ইতিহাসাদির প্রচারে অধিকতর বিলম্ব হইয়া থাকে; এবং ইতিহাস বহুকাল

ব্যাপিয়া কাব্য গ্রন্থেই অনুপ্রবিষ্ট থাকে। কেবল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নহে, কিন্তু প্রাচীন সভ্য জাতিদিগের প্রাচীন ইতিহাস সকল দেশেই এইরূপ তমসাচ্ছন্ন। সর্ব্বত্রই পুরাকালীন কাব্য-গ্রন্থ প্রাচীন সভ্য জাতিদিগের পূর্ব্বাবস্থার ঐতিহাসিক যাথার্থ্য নিরূপণের প্রধান সহায়।

পণ্ডিতবর হিয়ূমের উক্তি প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিলে এ বিষয়ে অনেক পোষকতা হইতে পারে। তিনি বলেন ‘কবি-গণ কল্পনার অতিরঞ্জনে যদিও প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া ফেলেন, এবং স্বেচ্ছাচার বশতঃ যদিও তাঁহারা সত্য ঘটনাকে নানা প্রকার অদ্ভুত অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, কিন্তু তাঁহারাই পুরাকালের একমাত্র ইতিহাস বেত্তা। তাঁহা-দিগের সেই সকল অতিরঞ্জনের অভ্যন্তরেই জগতের প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস মূলরূপে অবস্থান করিতেছে।’

অতএব ঐতিহাসিক তত্ত্ব সঙ্কলনে অপটু বা অনিচ্ছুক এবং সভ্যতায় প্রাচীনতম আর্য্যজাতির পুরাকালীন ইতিহাস যে কল্পনা জালে অধিকতর জড়িত এবং অপ্রাকৃত ঘটনার অন্ধকারে গাঢ়তর সমাচ্ছন্ন থাকিবে কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতঃপর আমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাভার-তের অন্তর্গত দুই একটি ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসরণ করতঃ এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন “মহারাজ! পুরা-কালে যামদগ্ন্য পরশুরাম পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করেন; বর্ত্তমানে যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত তাঁহারা অবরজ, সুতরাং ক্ষাত্র ধর্ম্মে পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের সমকক্ষ নহেন।” কিন্তু ক্ষাত্র-

ধর্ম্মের তথাবিধ দুর্গতির সময়েও ক্ষত্রীয় বীরগণ যেরূপ মহাপ্রাণতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন পৃথিবীতে তাহার তুলনা অতিশয় বিরল।

মহাত্মা ভীষ্মের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া ব্যাসদেবও তাঁহাকে দেবী পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ক্ষত্র ধর্ম্মাক্রান্ত দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্যের সমকক্ষ বীর ভূতকালেও হয় নাই ভবিষ্যতেও হইবে না, ইহা প্রচলিত কথা; তৎপুত্র অশ্বত্থামাও পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন মহাভারতের দুই প্রধান পুরুষ; আবার কর্ণের বীরত্বের তুলাদণ্ডে তাঁহাদিগের অন্যতর ধনঞ্জয়ের বীরগৌরব তুলিত হইয়াছে। মদোদ্ধত ভীমসেন বীর্য্যের আদর্শ, তাঁহার শারীরিক বীর্য্যের পরিমাণ করিতে না পারিয়া কল্পনা তাঁহাকে অযুত মত্ত হস্তীর বলধারী বলিয়াছে; মগধরাজ জরাসন্ধ উগ্রতর যজ্ঞে বলীরূপে উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক নৃপতিকে গিরিদুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন; কৃষ্ণাদি তাঁহার ভয়ে পলায়ন করিয়া গোমন্ত পর্ব্বতে দুরাক্রম্য কুশস্থলী নগরীতে সমাশ্রিত হইয়াছিলেন এবং আরও বহুসংখ্যক রাজা সুতামাত্য সহকারে নানা দিগ্‌দেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন। শিশুপাল জরাসন্ধের প্রবল সহায় ছিলেন, এবং তাঁহার বীরবিক্রম কেবল কৃষ্ণের নিকটেই পরাভবনীয় ছিল। তদ্ভিন্ন দৃঢ়-বিক্রম রাজা জয়দ্রথ, ভারতাচার্য্য মহাবীর্য্য কৃপ, প্রখ্যাত তেজা ভোজরাজ ভীষ্মক, শত্রু বিমর্দ্দন পুরুজিৎ, ধনুর্দ্ধর রুক্মী, বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ইঁহাদের সমকক্ষ বা অনুবর্ত্তী আরও অসংখ্য ভারত-বীর তৎকালে অদ্ভুত বীরত্ব-

মহিমা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের বীর-কীর্ত্তি সমূহ কবির অতুলনীয় ভাষায় কল্পনা বিজড়িত হইয়া অনুপম শোভার আস্পদ হইয়া রহিয়াছে। অথচ কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন "মহারাজ, এখনকার অবরজ ক্ষত্রিয়গণ ক্ষাত্র-পরাক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সমকক্ষ নহেন।"

যাহা হউক পরশুরাম ক্ষত্রিয়বলের যে ভয়ানক অপচয় করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। অবিরত চেষ্টায় মহাভারতের সময়ে প্রকৃতি সে ক্ষতির বহু পরিমাণে পূরণ করিয়াছিল। যদি সেই উপচিত বল কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে পুনরায় বিধ্বস্ত হইয়া না যাইত, তাহা হইলে উন্নতির উচ্চতম সিংহাসন হইতে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ভারতমাতার শোচনীয় অধঃ-পতন বোধ করি ভারতসন্তানকে দেখিতে হইত না; সম্ভবতঃ ইন্দ্রপ্রস্থ পৃথিবীর রাজধানী বলিয়া বহুকাল উচ্চ গৌরবে গৌরবান্বিত থাকিত। কিন্তু বিধাতার তুলিকায় ভারত-মাতার অদৃষ্টেরলিপী অন্যরূপ চিত্রিত হইয়াছিল।

মহাসত্ব পাণ্ডুপুত্রদিগের রাজসূয় মহাযজ্ঞ ভারতেতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা। ঐ সময়ে ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষীয়গণ জ্ঞাতি-রক্তে সমর পিপাসা নিবারণ করিতে অতিশয় অভ্যস্ত ছিলেন। যখন যে রাজা প্রবল হইয়াছেন, তিনিই বাহুবলে প্রতিবেশী রাজন্য বর্গকে পর্য্যুদস্ত করিয়া চক্রেশ্বর হইবার জন্য চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কেহ কেহ বুঝিয়াছিলেন যে, প্রতিবেশী সমাজপতিগণ নিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত থাকিলে সমাজের আভ্যন্তরিক উন্নতির নিতান্ত বিপর্য্যয় ঘটে। একটি প্রবল

শক্তির নিকট সকলে নতশির থাকিলে সেরূপ অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা বহু পরিমাণে তিরোহিত হয়; এবং ক্রমেই জাতীয় বলবৃদ্ধির নানা প্রকার উপকরণও সমাজের আয়ত্ত হইতে থাকে।

এ জন্যই যখন প্রভূত সহায়-বলসম্পন্ন ধর্ম্মবুদ্ধি মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় মহাযজ্ঞ সাধনে অভিলাষী হইলেন, তখন দূরদর্শি-ভারত-হিতৈষীদিগের আশা হইল যে, অতঃপর ভারত-সমাজ জাতীয় বন্ধনে দৃঢ় হইয়া বিরাট শক্তির আধার হইবে, এবং নির্ব্বিঘ্নে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া পৃথিবীতে চির প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিবে।

যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল, পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের মন্ত্রচাতুর্য্যে ও আপনাদিগের বলসম্পদে রাজবর্গকে করায়ত্ত করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞ বহ্বাড়ম্বরে সম্পাদন করিলেন। প্রতিবেশি-রাজগণ সকলেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করতঃ যজ্ঞ কার্য্যে সহায়তা করিলেন। যাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে চক্রেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন তাঁহারা পাণ্ডব-বলের নিকট পরাভূত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন, অথবা তাঁহাদিগের বীরত্ব-বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া শমন সদনে গমন করিলেন।

কিন্তু এই ঐক্য-বন্ধনে ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয় নাই; বরং রাজসূয়ের সফলতার উপরে ভারতবর্ষের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ অবনতির সুদৃঢ় দুর্গ-ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। মহাভারতের মহাকবি যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবর্ষি নারদের উপদেশচ্ছলে রাজসূয়ের গুণোৎকীর্ত্তন করিয়া তৎপর বলিয়া-

ছিলেন "রাজসূয় মহাযজ্ঞে ক্ষত্রিয়দিগের শমন সদৃশ পৃথিবী-বিধ্বংসী ভয়ানক যুদ্ধ ঘটনারও সূত্রপাত হইতে পারে!" যদিও যজ্ঞকালে তথাবিধ আপদের অসম্ভাব ছিল কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই উহাদ্বারা আর্য্য সমাজ গুরুতর রূপে আক্রান্ত হইল।

মহাভারতে নির্দ্দিষ্ট আছে, রাজসূয় মহা ব্যাপারে পাণ্ডব দিগের অতুলনীয় সমৃদ্ধি এবং তদুপরি অসাধারণ বিজয়শ্রী অবলোকন করিয়া ক্রূরমতি দুর্য্যোধন ঈর্ষার বিষ-দহনে দগ্ধ হইতেছিল। দুর্য্যোধনের ঈর্ষ্যাদগ্ধ পাপ বুদ্ধি অন্ধরাজকে প্ররোচিত করিয়া সুহৃদ্দ্যূতের অনুষ্ঠান করিল। বাসনা যে, কূট উপায়ে দ্যূতাসক্ত স্থির-প্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে পরাভূত করিয়া অক্লেশে তাঁহার রাজ্যধনাদি জয় করিয়া লইবে। মহা-বুদ্ধি ধর্ম্মজ্ঞ বিদুরের নিষেধ সত্তেও দুর্য্যোধনের সহিত দ্যূত-ক্রীড়ার্থে অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিলেন। যুধিষ্ঠিরের এই ক্ষাত্রপ্রতিজ্ঞা প্রসিদ্ধ ছিল যে, যুদ্ধেই হউক আর দ্যূতেই হউক আহূত হইলে কদাচ নিবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু ক্রীড়া-কৌশল অবগত ছিলেন না। এই সুহৃদ্দ্যূত যে ভয়ানক অমঙ্গল-কর হইবে তাহা জানিয়াও তিনি নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে লিপ্ত হইলেন। কপট ক্রীড়ক শকুনি তাঁহার প্রতিপক্ষ নির্ণীত হইল। তাহার কৌশলে যুধিষ্ঠির সমস্ত রাজ্য সম্পদ হারাইয়া পরিশেষে ক্রমান্বয়ে ভ্রাতৃবর্গকে আপনাকে এবং দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণীভূত করিয়া পরাভূত হইলেন। পণে পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ বিশেষতঃ রাজপুত্রী ও রাজ-কুলবধু পতি প্রাণা দ্রৌপদী দুর্য্যোধনাদির নিকট যেরূপ মর্ম্মান্তিক অপমান ও লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতেও

হৃদয় স্তম্ভিত হয়। রাজসূয় মহাযজ্ঞে যে ক্ষত্রিয় জীবঘাতি-অমঙ্গল-বীজ উপ্ত হইয়াছিল দ্যূত সভায় সেই দিন পতি-প্রাণার অশ্রু বিন্দু প্রবাহে এবং মর্ম্মবেদনার উষ্ণ নিশ্বাসের উত্তাপে তাহা অঙ্কুরিত হইল। উহাই কালে কুরুক্ষেত্রের বিস্তৃত প্রান্তরে এক মহাদ্রুমরূপে পরিণত হইয়া ভারতবর্ষের ভয়ানক অমঙ্গল সাধন করিয়াছিল। সেই পাপতরুর বিষ-ফল আস্বাদ করিয়াই তদানীন্তন আর্য্য বীরগণ অসময়ে কালের কুক্ষিগত হইয়াছিলেন, শোকে দুঃখে উন্নতির সৌধ-চূড়া হইতে ভারত-মঙ্গল অধঃপতিত হইয়াছিলেন এবং মনুষ্য মধ্যে অপরিচিত আধুনিক ভারত সন্তানগণও তৎপ্রভাবেই ঈদৃশ ম্রীয়মান অবস্থায় দুঃখের জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

দ্যূত সভায় অন্ধরাজের কৃপায় পরাজিত পাণ্ডবগণ স্বাধীনতা ও রাজ্য ধনাদি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তৎপর পুত্র-হিতকামী ধৃতরাষ্ট্রের নিদেশে দ্বিতীয় বার যুধিষ্ঠির ক্রীড়ার্থে আহূত হইলেন। এবার দীর্ঘকালের জন্য পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসন এক মাত্র পণ রহিল, পণে পরাভূত হইয়া তাঁহারা বনগমন করিলেন।

বন গমন পাণ্ডবগণের ততদূর কষ্টকর হয় নাই, কিন্তু কৌরব কর্ত্তৃক পতিপ্রাণা দ্রৌপদীর দ্যূত সভায় অমানুষ অত্যাচার বিষ-দিগ্ধ শেলের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ের মর্ম্ম-স্থানে দারুণ বেদনা প্রদান করিতেছিল। ধর্ম্মপণে প্রতিকা-রের পথ অবরুদ্ধ বলিয়া তাঁহারা সে অত্যাচার নীরবে সহ্য করিলেন; কিন্তু সরল প্রকৃতির লোক মনোভাব চাপিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না, এ জন্য দ্যূত সভায় ভীমসেন ক্ষণে

ক্ষণে বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন; এবং গুরু-লোকের আদেশে ও ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা স্মরণ করতঃ নিরস্ত হইতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর প্রতি অত্যাচার কালীন অভিমানী ভীমসেনের ভ্রূকুটি-ভীষণ অগ্নিমূর্ত্তি সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শন করিব না; বন প্রস্থান কালে আত্মশক্তির উপর অটল-আস্থাবান সেই স্পষ্টবাদী ভীম কুরু সভাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরভাবে যাহা বলিয়াছিলেন তদ্দারাই পাণ্ডবদিগের মর্ম্মান্তিক বেদনার বিলক্ষণ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। মহাকবির পদানুসরণ করিয়া দুই একটি কথা লিখিত হইতেছে।

অজীনধারী বৃকোদর কহিলেন "দুর্য্যোধনকে আমিই নিহত করিব; কর্ণকে ধনঞ্জয় বধ করিবেন; এবং অক্ষ-কিতব শকুনিকে সহদেব বিনাশ করিবেন। আর আমি পুনরায় সভামধ্যে এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতেছি, যদি আমাদিগের যুদ্ধ ঘটনা উপস্থিত হয়, তবে দেবগণ ইহা অব-শ্যই সত্য করিবেন যে, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র পশুর রক্ত পান করে তদ্রূপ আমি পাপমতি বাক্যশূর দুরাত্মা দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়া ইহার রুধির পান করিব। এবং ক্রোধ লোভের বশানুগ হইয়া যাহারা ইহার অনুগমন করিবে তাহাদিগকেও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিব।"

দুঃশাসন দ্রৌপদীর প্রতি অত্যাচার এবং কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়া পাণ্ডবদিগের মনে অধিকতর বেদনা প্রদান করিয়াছিল।

পাণ্ডবগণ বন প্রস্থান করিলেন, ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে তাঁহারা যথাবিহিতরূপে পণে উত্তীর্ণ হইয়া দুর্য্যো-

ধনাদির নিকট রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। দুর্য্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিতে অসম্মত হইলে, ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভ্রাতার জন্য পঞ্চ সংখ্যক গ্রাম মাত্র প্রার্থনা করিলেন। দুর্য্যোধন তাহাতেও অসম্মত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন বিনা রণে সূচ্যগ্র ভূমিও প্রদত্ত হইবে না।

তখন যুদ্ধ ঘটনা অনিবার্য্য হইল, পাণ্ডবদিগের সুদীর্ঘ অনুপস্থিতিতে দুর্য্যোধনের শাসন রাজ্যে দৃঢ় বদ্ধ হইয়াছিল। তখন কৌরবদিগের সহায়-বলের অবধি নাই। নিঃসহায় পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া যে কৃতকার্য্য হইবেন, দুর্য্যোধন ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ অথবা অনিচ্ছুক হইলেন।

দুর্য্যোধন ব্যতীত পাণ্ডবদিগের রাজসূয়যজ্ঞে সমাগত অপরাপর নরপাল বর্গের মধ্যেও যে অনেকে অমর্ষান্বিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। যজ্ঞান্তে সৎকারার্হ নরপতিগণের মধ্যে ভীষ্মের নির্ব্বাচনে কৃষ্ণকে প্রথমঅর্ঘ্য প্রদত্ত হইলে প্রবল প্রতাপান্বিত চেদিপতি শিশুপাল ভীষ্মের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করেন, এবং পাণ্ডবদিগের প্রধান সহায় কৃষ্ণের নিন্দা করিয়া তাঁহার হস্তে সভাস্থলেই নিহত হন। তদ্দৃষ্টে শিশুপালের অনুবর্ত্তী অমর্ষান্বিত অপরাপর নরপতিবর্গ মনঃক্ষোভ গোপন করিয়া, অপমান জনিত বেদনা কার্য্যে প্রকাশ না করিয়া স্ব স্ব রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পাণ্ডবদিগের প্রতিকূলে সহসা অভ্যুত্থান করিতে কাহারও শক্তি ছিল না; তাঁহারা সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনতিদীর্ঘকাল পরেই কুরুপাণ্ডবগণের গৃহ বিচ্ছেদে তাঁহা-

দিগের অভিলষিত সুযোগ উপস্থিত হইল। সেই অমর্ষান্বিত নরপতিগণ যে, কুরুক্ষেত্রের সমরভূমিতে প্রবল-শক্তির দ্যোতক মহারাজ দুর্য্যোধনের পতাকামূলে সমবেত হইতে সহজেই ব্যগ্র হইলেন, ইহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে।

এ দিকে নির্ব্বাসিত অবস্থায় ধর্ম্মবুদ্ধি পাণ্ডবগণের সহিতও অনেক প্রধান প্রধান আর্য্যবীরের সখ্য হইয়াছিল, আর তাঁহাদের সুশাসন, ধর্ম্মবুদ্ধি ও অতুল বিক্রমের আকর্ষণীতেও অনেক সহায় বল উপার্জ্জিত হইয়াছিল, সুতরাং উভয় পক্ষই অপর্য্যাপ্ত সহায় প্রাপ্ত হইলেন। সমস্ত নরপালগণ কুরু-পাণ্ডবের একতর পক্ষে যোগদান করিলেন। আর্য্যভূমির প্রায় সমস্ত বল এই ভ্রাতৃ দ্রোহে বা ভারতের অদৃষ্ট পরীক্ষায় অথবা আত্মহিত বিসর্জ্জন দিবার জন্য সাগ্রহে সম্মিলিত হইল। কথিত আছে, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা জ্ঞাতি রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিবার জন্য সেই কুরুক্ষেত্রের কাল সমরে যুদ্ধ করিয়াছিল।

জ্ঞাতি রক্তে স্নান করিয়া যুধিষ্ঠির বিজয় লাভ করিলেন, কিন্তু বিবেকের আঘাতে জীবনে সুখী হইতে পারিলেন না। সেই গুরুতর নরহত্যা-পাপের শান্তিজন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন; বহু কষ্টে বহু বিঘ্নে সে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। সমাজ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডবদিগের আত্মশক্তিরও বিনাশ হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষের যতদূর অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে, বোধ করি অতীত ঘটনার আর কিছুতেই তেমন হয় নাই। সেই পাপ সময়ে ভারতবর্ষ যে সকল মহাত্মা হারা-

হইয়াছেন, কত সহস্র বৎসর সাধনায় সে সকল ধন ফিরাইয়া পাইবেন ভবিষ্যৎ তাহার সাক্ষী। ভারতমাতার তেমন সুপুত্র-গণ পুনরায় মাতৃ ক্রোড় শোভিত করিবেন কি না বলিতে পারি না, আমাদিগের দূর দৃষ্টি ততদূর প্রখর নহে। তবে একথা সহজেই বলা যাইতে পারে যে, সেই মহাসমরে যে অগণিত মহাপ্রাণ ভারতবীরের ধ্বংস হইয়াছে, প্রকৃতির সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপি মহাচেষ্টায়ও তাহাদিগের উদ্ভব হওয়া সুকঠিন।

সেই মহা যুদ্ধে ভারতের প্রধান প্রধান সমস্ত বীরগণ সমবেত হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধাবসানে কয়েক প্রাণিমাত্র অব শিষ্ট ছিলেন। অতএব এক বিরাট আঘাতে সহস্র সহস্র বর্ষের উপার্জ্জিত আর্য্য-বল চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। পরশুরাম এক-বিংশতিবারের আসুরিক চেষ্টায় যে বল ধ্বংস করিতে পারেন নাই, কুরুক্ষেত্রের পাপ সমর এক উদ্যমে সেই ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। সেই দিন হইতেই ভারতভূমি যথার্থ নিক্ষত্রিয়া, সেই দিনেই পরাধীনতার অব্যর্থ বীজ ভারতক্ষেত্রে রোপিত হইয়াছিল এবং বিধাতার তুলিকায় পর-পদাঘাতের কঠোর লিপি ভারত সন্তানের অদৃষ্টে লিখিত হইয়াছিল!

শব্দ।

প্রতিনিয়ত নানা প্রকার শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। কোমল বা কঠোর, মৃদুল বা গম্ভীর, মনোহর বা অপ্রীতিকর বিবিধ শব্দ সর্ব্বদা চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইতেছে। নীরব প্রকৃতি কবির কল্পনা মাত্র। লীলাময়ী প্রকৃতিদেবীর সেই বিচিত্রতা-

বিহীন ভাব আমরা কাব্যে পাঠ করি, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। চেতনা সর্ব্বতোভাবে অসাড় না হইলে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা আমরা সম্যকরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হই না।

শব্দ যদিও অতি সামান্য ব্যাপার, যদিও আমাদিগের শ্রুতির অবারিত দ্বারে অচিন্তিতরূপে উহা অজস্র আগমন করিতেছে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শি-বৈজ্ঞানিকগণের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসা এই সামান্য বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াও নানাবিধ আশ্চর্য্য, মনোহর ও জ্ঞানবর্দ্ধক তত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছে। তৎসম্বন্ধে কতিপয় স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য কথা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

আঘাত অথবা ঘর্ষণাদিদ্বারা পদার্থ সমূহের পরমাণুরাশির এক প্রকার অতি দ্রুত স্পন্দন উপস্থিত হয়, উহাই শব্দোৎপত্তির কারণ। যে বস্তু তুলনায় যত অধিক স্থিতিস্থাপক,* তাহারই ঐরূপ কম্পন তত অধিকতর বেগে

---

* স্থিতিস্থাপক বলিলে যে, কয়েকটি মাত্র বস্তুকে বুঝায় তাহা নহে, আমরা ইতস্ততঃ যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই সে সমস্তই স্থিতিস্থাপক। আঘাত ও ঘর্ষণ আকর্ষণাদিদ্বারা কোন রূপ অবস্থান্তর ঘটিলেও যে যে বস্তুর পরমাণু সমূহ আপনা আপনি নিজের পূর্ব্বস্থিতি লাভ করিতে পারে অর্থাৎ সহজেই পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত হইতে পারে, সেই সকল বস্তুই স্থিতিস্থাপক। প্রায় যাবতীয় জড়পদার্থই স্থিতিস্থাপক। তবে কাহারও স্থিতিস্থাপকতা গুণ অতি অল্প কাহারও বা অত্যন্ত অধিক। লৌহাদি যাবতীয় ধাতু দ্রব্য এবং বায়ু, উর্ণা, রবার, কেশ, চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থ বিলক্ষণ স্থিতিস্থাপক।

সম্পন্ন হয় ও তত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, সুতরাং তাহা হইতেই তত উচ্চ ও দীর্ঘকাল ব্যাপী শব্দের উদ্ভব হইয়া থাকে।

শব্দায়মান বস্তু ও শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ভাবে কোনও পদার্থ ব্যবধান না থাকিলে শব্দ শ্রুত হয় না। শব্দায়মান বস্তুর কথিত কম্পনের ঘাত প্রতিঘাতে মধ্যবর্ত্তী পদার্থ কম্পিত হইয়া কর্ণ মধ্যে শব্দ পরিচালনা করে। পরন্তু ঐ মধ্যবর্ত্তী পদার্থ একটিও হইতে পারে, একাধিকও হইতে পারে। কিন্তু একাধিক পদার্থের মধ্য দিয়া শব্দ পরি-চালিত হইলে, গমন সময়ে ঐ সকল বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা শব্দ-তরঙ্গ বিলক্ষণ প্রতিহত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা শব্দের উচ্চতার হ্রাস এবং গতির খর্ব্বতা সংসাধিত হয়। যাহা হউক সচরাচর শব্দ বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়াই আমাদের কর্ণ-কুহরে সমুপস্থিত হয়। শব্দায়মান বস্তুর পরমাণু সমূহের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুরাশি তরঙ্গিত হয়, ঐ তরঙ্গ কর্ণ-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া কর্ণ-পটহকে কম্পিত করিলেই শব্দ শ্রুতিগোচর হয়।

সাধারণতঃ বায়ুর সাহায্যে শব্দ পরিচালিত হয়, সুতরাং বায়ু যেখানে যত লঘু, সেখানে শব্দ তত অনুচ্চ শ্রুত হয়। পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বায়ু অপেক্ষা দূরের বায়ু ক্রমেই লঘুতর, এই জন্য অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে পিস্তল ছুড়িলেও তাহা হইতে পটকার শব্দের ন্যায় মৃদু শব্দ সঞ্জাত হয়। বায়ু আকাশময় বিস্তৃত নহে, সুতরাং এরূপ লঘু বায়ুও ঊর্দ্ধে বহুদূর বর্ত্তমান নাই। ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থ বায়ুরাশি ক্রমে যে পরিমাণে লঘু হইয়া গিয়াছে তদ্দৃষ্টে কোন কোন প্রধান পণ্ডিত অনুমান

করেন, ভূমণ্ডলের চতুঃপঞ্চাশৎ মাইল ঊর্দ্ধে বায়ু বিদ্যমান নাই; অতএব তথায় কোনরূপ শব্দেরও উদ্ভব হয় না। এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডলের আয়তনের তুলনায় চতুঃপঞ্চাশৎ মাইল কিছুই নহে; অতএব পৃথিবীর উপরে অতি অল্পমাত্র স্থানেই শব্দোৎপত্তির কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বায়ু-মণ্ডলের ঊর্দ্ধদেশে সহস্র সহস্র কামান ধ্বনির তুল্য শব্দোৎ-পাদনের কারণ উপস্থিত হইলেও কিছুমাত্র শব্দ হইবে না, যেখানে বায়ু অথবা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ঈদৃশ অপর কোনও পদার্থ বর্ত্তমান নাই সেখানে শব্দও নাই।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এ সত্যের সুন্দর সমর্থন করেন। একটি শব্দায়মান ধাতুযন্ত্র কোনও উপযুক্ত কাচপাত্রের মধ্য দেশে সন্নিবিষ্ট করিয়া বায়ুর প্রবেশ-পথ অবরোধ করতঃ বাতনির্য্যান যন্ত্রযোগে তাঁহারা পাত্রের বায়ু বাহির করিয়া ফেলিতে থাকেন, বায়ু যতই কমিতে থাকে মধ্যস্থিত শব্দিত যন্ত্রটির ধ্বনিও ততই অনুচ্চ শ্রুত হইতে থাকে। ক্রমে কাচ পাত্রটি বায়ুশূন্য হইলে আর শব্দ শ্রুত হয় না। তখনও শব্দকারক ধাতুখণ্ডের উপরে কৌশল-নিবদ্ধ হাতুড়ি পুনঃপুনঃ আঘাত করিতে থাকে বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা পূর্ব্ববৎ শব্দের উদ্ভব হয় না। তখন শব্দস্থানের পর আকাশ, তৎপর কাচের আবরণ তৎপর বায়ু, এবং তাহার পর আমাদিগের কর্ণ-পটহ। শূন্যস্থান অথবা আকাশ কোনও পদার্থ নহে, সুতরাং এখানে কর্ণ পটহ ও শব্দ স্থান এক বা একাধিক বস্তু দ্বারা সম্মিলিত হয় নাই, এজন্যই শব্দ শ্রুত হইল না।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের গঠন অতি চমৎকার, তাহার কার্য্য অতিশয় জটিল। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সেই জটিল বিষয়ের সম্পূর্ণ আলোচনা হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ শব্দ-শ্রুতি বিষয়ক সমুদয় তত্ত্ব অদ্যাপি অবিসংবাদিত রূপে নির্ণীতও হয় নাই। তবে ইহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, শব্দজনক বায়ু-তরঙ্গ কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তথাকার পটহ-চর্ম্মবৎ চর্ম্ম-বিশেষকে প্রথমে কম্পিত করে। ঐ চর্ম্মখণ্ডে এক পংক্তি শৃঙ্খলিত অস্থিময় পদার্থ সংলগ্ন আছে, শব্দ তাহার সাহায্যে চালিত হইয়া আরও অভ্যন্তরে পূর্ব্ববৎ আর এক খণ্ড সূক্ষ্ম আবরণ চর্ম্মে ও তৎপর শ্রবণেন্দ্রিয়ের শেষ সীমায় নীত হয়। এখানেই শ্রবণ-জ্ঞানের প্রকৃত ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। কর্ণের উক্ত স্থান এক প্রকার তরল পদার্থে পূর্ণ। শব্দ তরঙ্গ ঐ তরল বস্তুতে বাহিত হইয়া তত্রত্য স্নায়ু-সূত্রকে উত্তেজিত করে। স্নায়ু এক প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী, উহা দেহের সমুদায় অঙ্গেই পরিব্যাপ্ত আছে। ঐ সকল স্নায়ু-সূত্রের যোগেই ইন্দ্রিয়লব্ধ যাবতীয় জ্ঞান মনোযন্ত্র মস্তিষ্কে নীত হয় এবং মনোজাত ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে চালিত হয়। সুতরাং শব্দতরঙ্গ কর্ণাভ্যন্তরীন স্নায়ু-সূত্রসমূহকে উত্তেজিত করিলেই মস্তিষ্কে শ্রবণজ্ঞান সমুপস্থিত হয়; অর্থাৎ আমরা শব্দ শুনিতে পাই।

কিন্তু শ্রবণ-জ্ঞান সম্পন্ন হইতে যত আড়ম্বর বর্ণিত হইল, শব্দ শুনিতে তাহার কিছুই অনুভূত হয় না। ঈশ্বরের রচনা-কৌশল এমনই আশ্চর্য্য যে, শব্দের কারণ উপস্থিত হওয়া মাত্রই তাহা শ্রুতিগোচর হয়; কিন্তু বস্তুতঃ শব্দতরঙ্গ বায়ু-

রাশিতে বাহিত হইয়া কর্ণ রন্ধ্রে প্রবেশ করিতে যে কিছু-মাত্র গৌণ হয় না তাহা নহে। বিদ্যুৎ প্রকাশের কিছু কাল পরে বজ্রধ্বনি শ্রুত হয়, দূরে বন্দুক ছুড়িলে অগ্রে ধূম দৃষ্ট হয়, পশ্চাৎ শব্দ শ্রুত হয়। ইহার কারণ কি? বিদ্যুৎ প্রকাশ বা ধূমোদ্গমের পরে শব্দ হয় না, উহা সমকালেই জন্মে; তবে দূর হইতে শব্দ-জনক বায়ু-তরঙ্গ আমাদের কর্ণরন্ধ্রে আসিয়া সমুপস্থিত হইতে কিয়ৎ পরিমাণ গৌণ হয় মাত্র। জলাশয়ে ঢেলা নিক্ষেপ করিলে যেমন জলে একটি তরঙ্গ জন্মে; শব্দ দ্বারাও বায়ুরাশি সেই রূপ তরঙ্গিত হয়, কিন্তু বায়ু অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া আমরা সে তরঙ্গ চক্ষে দেখিতে পাই না। যাহা হউক উল্লিখিত জলের তরঙ্গ যেমন অল্পে অল্পে দূরবর্ত্তী স্থানে বিস্তৃত হয়, শব্দ জনক বায়ু-তরঙ্গও সেই রূপ ক্রমে দূরে বিস্তৃত হয়। সুতরাং শব্দ যত দূর হইতে আইসে ততই শুনিতে গৌণ হয়। এদেশে বায়ুর ভিতর দিয়া শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১১৫০ ফীট অর্থাৎ প্রায় ৮০০ হস্ত দূরে গিয়া থাকে*; অতএব ৮০০ হস্ত দূরে বন্দুক ছুড়িলে ধূম দর্শনের এক সেকেণ্ড পরে শব্দ শুনা

---

* এদেশে বায়ুর ভিতর দিয়া শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১১৫০ ফীট হয় বলা হইল; বাস্তবিক দেশের উষ্ণতা ও শীতলতার তারতম্যানুসারে এই গতিরও তারতম্য হয়। বায়ু যত শীতল হইবে তন্মধ্য দিয়া শব্দের গতির বেগ তত অল্প হইবে। বায়ু বরফের ন্যায় শীতল হইলে তন্মধ্য দিয়া শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১০৯৩ ফীট গমন করে, এবং বায়ুর তাপ তাপমান যন্ত্রের এক এক অংশ করিয়া বৃদ্ধি পাইলে শব্দের গতির বেগ ২ফীট করিয়া বর্দ্ধিত হয়। এই হিসাবে কলিকাতায়

যায়। যে মেঘ ভূপৃষ্ঠ হইতে এক ক্রোশ অর্থাৎ ৮০০০ হস্ত উপরে, তাহার বিদ্যুৎ প্রকাশের ১০ সেকেণ্ড্ পরে শব্দ হয়। সার্দ্ধ ক্রোশ উপরের মেঘের শব্দ বিদ্যুৎবিকাশের ১৫ সেকেণ্ড্ পরে শ্রুত হয়, ইত্যাদি †।

পরন্তু উক্ত জলের তরঙ্গ যেমন নিকটে প্রবল থাকে, যতই দূরে গমন করে ক্রমেই তত অল্প হয় এবং পরে চিহ্ন মাত্রও থাকে না, শব্দ জনক বায়ু তরঙ্গও ঠিক সেইরূপ। এজন্যই শব্দ নিকট হইতে যেমন শুনা যায়, দূর হইতে তেমন শুনা যায় না; অধিক দূর হইতে আর কিছুই শুনা যায় না।

শব্দ সাধারণতঃ প্রতি সেকেণ্ডে ১১৫০ ফীট গমন করে বটে; কিন্তু শব্দ-তরঙ্গ নানারূপে প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হওয়াতে এই সময়ের বহু ব্যতিক্রম হয়। বায়ু-স্রোতে বসিয়া কথোপকথন করিলে যতদূর উচ্চ রবে কথা বলিতে হয়; গৃহে সেরূপ হয় না। প্রাচীর ব্যবধান থাকাতে এক গৃহ

বায়ুর ভিতর দিয়া শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১১৫০ ফীট এবং ইংলণ্ডে প্রতি সেকেণ্ড ১১২৫ ফীট করিয়া হয়।

† আলোকের প্রভাবেই বস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে। শব্দ যেমন বায়ু তরঙ্গে চালিত হয়, দৃষ্ট বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন আলোক-রেখাও সেই রূপ ইথর নামক জগদ্ব্যাপী বস্তু বিশেষের তরঙ্গে বিভিন্নভাবে চালিত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর হয়; সুতরাং দূরের শব্দ শুনিতে যেমন কিছু গৌণ হয়, বহু দূরের বস্তুর দর্শন লাভ করিতেও কিঞ্চিৎ গৌণ হইয়া থাকে। কিন্তু সে গৌণ যৎসামান্য; আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় দুই লক্ষ মাইল। চন্দ্র যে এত দূরে, তাহা হইতেও পৃথিবীতে আলোক আসিতে অনধিক এক সেকেণ্ড মাত্র লাগে। অতএব বিদ্যুৎ প্রকাশের পর তাহা চক্ষে দেখিতে মুহূর্ত্ত মাত্রও গৌণ হয় না।

হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের কথা বার্ত্তা শ্রুত হয় না ; বায়ু প্রবাহে শব্দ তরঙ্গ বিরুদ্ধ দিকে তাড়িত হইলে নিকটের উচ্চ শব্দও অতিশয় মৃদু বোধ হয়। বায়ুর স্বাভাবিক স্রোতঃ এবং গমন পথের বিবিধ প্রতিবন্ধকতা বা উচ্চ নিম্নতা দূর করিতে পারিলে শব্দ অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক দূর গমন করিতে পারে। এক গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী অপর গৃহ পর্য্যন্ত একটি সরল চোঙ্গা সংযুক্ত করিয়া দুই ব্যক্তি দুই ঘরে চোঙ্গার দুই প্রান্তে উপবেশন করতঃ মৃদুস্বরে আলাপ করিলেও পরস্পর সুস্পষ্ট শুনিতে পাইবে ; কারণ চোঙ্গার ভিতর দিয়া যে শব্দ-জনক বায়ুতরঙ্গ চালিত হয় তাহা বায়ুর স্বাভাবিক স্রোতে তাড়িত হয় না, এবং তথায় অপর কোনরূপ গমন-প্রতিবন্ধকতা বা নিম্নোচ্চতাও বর্ত্তমান থাকে না। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ফরাসী দেশীয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এম্ বিও অন্যূন দুই সহস্র হস্ত দীর্ঘ ধাতুময় নলের ভিতর দিয়া অতি মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতে পারিয়াছিলেন। পরন্তু ঐ রূপ শব্দ-পরিচালক নলের ছিদ্র যতই বৃহৎ হইবে ও তাহার পরিধি যত অসমান হইবে শব্দ ততই অল্পদূর বাহিত হইবে।

বায়ু রাশির অভ্যন্তর দিয়া শব্দ তরঙ্গ কিরূপ বেগে বাহিত হয় তাহা বলা হইল, কিন্তু অপরাপর বস্তুর মধ্যদিয়া ঠিক ঈদৃশ বেগে পরিচালিত হয় না। কোন কোন পদার্থের শব্দ-পরিচালকতা গুণ বায়ু অপেক্ষা অনেক অধিক, কোন কোন পদার্থের বহু পরিমাণে অল্প। জলের শব্দ-পরিচালকতা গুণ বায়ুর প্রায় চতুর্গুণ, লৌহের শব্দ-পরিচালকতাগুণ

বায়ুর প্রায় পঞ্চদশ গুণ; অপরাপর বস্তুর শব্দ-পরিচালকতা সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এইরূপ নানা ইতর বিশেষ মান নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত এম্ বিও একদা লৌহময় নলে শব্দ চালিত করিয়া একটি শব্দ হইতে কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ দুইটি ধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। প্রথমটি নলের পরিবেষ্টক লৌহের ভিতর দিয়া আসিয়াছিল, দ্বিতীয়টি নলের মধ্যস্থিত বায়ু রাশির সহিত চালিত হইয়া আসিয়াছিল।

বায়ু অপেক্ষা জলের শব্দ পরিচালকতা অধিক বলিয়া, জলপথে চলিতে দূরাগত শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। আবার স্থির জল পূর্ব্বোক্ত চোঙ্গার ন্যায় কার্য্যকারী। চোঙ্গায় যেমন বাধা বা উচ্চ নিম্নতার অসদ্ভাব, স্থির জলের উপর দিয়া শব্দতরঙ্গ চালিত হইতেও সেইরূপ কোনও বাধা বা উচ্চ নিম্নতার প্রতিবন্ধকতা ঘটে না; সুতরাং তাহা অধিক দূর চলিয়া যাইতে পারে। আবার যখন বায়ু প্রবাহ স্থিরভাবে প্রবাহিত হয়, অপর কোলাহলও অধিক বিদ্যমান থাকে না, সেই নির্ব্বাত নিস্তব্ধ সময়ে জলের উপর দিয়া আরও অধিকতর বেগে শব্দ পরিচালিত হয়। এ জন্যই তেমন অবস্থায় বহুদূরের শব্দও সহজে শ্রুত হয়। ডাক্তার ইয়ং লিখিয়াছেন তিনি এইরূপে ১০ মাইল দূরে থাকিয়া মনুষ্যকণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন।

যদিও সকল বস্তু হইতে তুল্যরূপ শব্দ হয় না, এবং সকল শব্দ সমান দূর গমনেও সমর্থ নহে; কিন্তু উচ্চই হউক আর মৃদুই হউক, গম্ভীরই হউক আর তীক্ষ্ণই হউক শব্দের

সর্ব্ব প্রকার ধ্বনিই সমবেগে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। এ জন্যই ঐকতান-বাদ্যের বিভিন্ন প্রকার উচ্চ নিম্নতা, ছেদ অনুচ্ছেদ প্রভৃতি অতি সুশৃঙ্খল ভাবে আমাদের শ্রুতিগোচর হয়। যদি শব্দেব বিভিন্নতা অনুসারে বেগের তারতম্য হইত, তাহা হইলে ঈদৃশ বাদ্যে কোনও মাধুর্য্য থাকিত না। বাদ্যের অদ্যোপান্ত সামঞ্জস্য না থাকিয়া কেবল একটা বিশৃঙ্খল ধ্বনির উদ্ভব হইত মাত্র *।

শব্দ দিবাভাগে যতদূরে পরিচালিত হয় রজনীতে তদপেক্ষা অনেক অধিক দূবে চালিত হইয়া থাকে, এবং রাত্রিকালে শব্দের ধ্বনি অধিকতর উচ্চ অনুভূত হয়। ইহার কারণ এই।—পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্র একরূপ নহে; একস্থান উন্নত, অন্যস্থান নিম্ন, কোথাও বৃক্ষ, কোথাও গৃহ, কোন স্থানে বারিরাশি কোন স্থানে বালুকা-ক্ষেত্র। ভূপৃষ্ঠের এইরূপ বিসদৃশ সংস্থানহেতু সূর্য্যকিরণে এক এক স্থান এক একরূপ উত্তপ্ত হয়, সুতরাং বায়ুরাশিও এক এক স্থানে এক এক প্রকার উত্তাপ প্রাপ্ত হয়; এবং নানাবিধ বাষ্পাদিতে উহা সংমিশ্রিত হয়। এই কারণে দিবাভাগে ভূপৃষ্ঠে বায়ুরাশি কোথাও কিছু শীতল ও ঘন, কোনস্থানে বা উত্তপ্ত ও লঘু, কোথাও জলকণা বা অপর বাষ্পরাশিতে ব্যাপ্ত, কোন স্থানে বা পরিষ্কৃত ও শুষ্ক। অতএব শব্দ-তরঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর

---

* অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, শব্দের উচ্চ নিম্নতা প্রভৃতির তারতম্য অনুসারে তাহার বেগেরও কিঞ্চিৎ তারতম্য হয়। কিন্তু তাহা এত সামান্য যে কদাচ অনুভূত হয় না; [illegible] ধর্ত্তব্য নহে।

ভিতর দিয়া চালিত হওয়ার সময়ে যেমন তত্তদ্বস্তুদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে প্রতিহত হয়, ভূপৃষ্ঠের উক্ত বিভিন্ন প্রকার বায়ুস্তরের ভিতর দিয়া চালিত হইতেও ঠিক সেইরূপ প্রতিহত হইয়া থাকে। এ জন্যই দিবাভাগে শব্দ অনুচ্চ শ্রুত হয়। বিশেষতঃ দিবাভাগে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শব্দ ধ্বনিত হইতে থাকে; সেই সকল ধ্বনির মূলীভূত শব্দ-তরঙ্গের প্রতিবন্ধকতাতেও কোন একটি শব্দ অধিক উচ্চ অনুভুত হইতে পারে না। কিন্তু রাত্রিতে সূর্য্যতাপ না থাকাতে বায়ুর অবস্থা সর্ব্বত্র একরূপ, এবং সাধারণ শব্দ-কোলাহলও কমিয়া যায় সুতরাং শব্দ অপেক্ষাকৃত অনেক উচ্চ অনুভূত হয় ও বহুদূর গমন করিতে সক্ষম হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার সুবিশাল অরণ্যে অসংখ্য আরণ্যজন্তুর বাস। দিবাভাগে অনতিদূরবর্ত্তী ভূভাগ হইতে ঐ সকল প্রাণীর কলরব শ্রুতিগোচর হয় না, কিন্তু রাত্রিকালে গভীর কোলাহল সমুৎপন্ন হইয়া চারিদিকে বহুদূর বিস্তৃত হয়। ঐ সকল আরণ্য-জীব যে দিবাভাগে নিঃশব্দে অবস্থান করে তাহা নহে, কেবল উপরোক্ত কারণেই তখন তাহাদের শব্দ দূর হইতে শ্রুতিগোচর হয় না।

ছত্রক ও দীপক উদ্ভিদ্।

সৃষ্টবস্তু মাত্রই ঈশ্বরের গভীর-জ্ঞান ও অনন্ত-কৌশলের সুন্দর নিদর্শন। মহিমান্বিত বিশ্বপতি জগতের সর্ব্বত্রই এরূপ শোভা ও কারুকার্য্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন

যে, প্রণিধান করিয়া যাহাতেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই বিস্মিত ও পুলকিত হইতে হয়। কিন্তু সমস্ত পদার্থে মনুষ্যের দৃষ্টি তুল্যরূপে আকৃষ্ট হয় না। আশৈশব দর্শন হেতু কোন কোন পদার্থ অতি বিস্ময় জনক গুণগ্রাম সম্পন্ন হইলেও সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হয়, আবার কোনও অপরিচিত বস্তু অতি সামান্য গুণশালী হইলেও বিলক্ষণ মনোযোগ আকর্ষণ করে।

আমরা নিয়ত উদ্ভিদ্‌ এবং প্রাণিবৃন্দে পরিবৃত রহিয়াছি, কিন্তু সেই সকল সাধারণ উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণিদেহের বিচিত্র কৌশল, আশ্চর্য্য ধর্ম্ম, এবং তাহাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় বিষয়ক অদ্ভুত ইতিবৃত্ত অল্প লোকেই অনুধাবন করিয়া দেখে। প্রাণিবর্গের অচিন্ত্য দেহ-কৌশল, মন ও চেতনার আশ্চর্য্য স্বভাব ও জড়-দেহের সহিত তাহাদের নিগূঢ় সম্বন্ধ; উদ্ভিদের বিচিত্র প্রকৃতি, অণু প্রমাণ বীজ হইতে প্রকাণ্ড তরুরাজের উৎপত্তি, কালে কালে বৃক্ষ লতাদির বিচিত্র শোভা সৌন্দর্য্য, এবং সমধর্ম্মাক্রান্ত গোময়মৃত্তিকাদি উপাদানে উৎপন্ন হইয়াও ফল মূলের বিভিন্ন রসাস্বাদ, প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌ জাতির জন্ম বৃদ্ধি ও মৃত্যু বিষয়ক আশ্চর্য্য একতা এবং পরস্পর নিগূঢ় যোগ অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু চিরপরিচিত বিষয় বলিয়া অনেকেই তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ বা চিন্তা বিনিয়োগ করেন না। কোন বিশেষ প্রকৃতি বিশিষ্ট পদার্থ অবলোকন করিলেই মুগ্ধ হইয়া তাহার গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে সকলে কৌতূহলাক্রান্ত হন।

ছত্রক একটি যৎসামান্য পদার্থ, সুতরাং তৎপ্রতি সাধারণের

দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার মনোজ্ঞ শোভা এবং অবস্থা বিশেষে বিবিধ বিচিত্র গুণ ও ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকৃতির রহস্যদর্শী বৈজ্ঞানিক সহজেই মুগ্ধ হইয়া যান এবং তাহার সেই সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সাধারণকে মোহিত করেন।

ছত্রক সর্ব্ব সাধারণেরই পরিচিত। অধিকাংশ ছত্রকের আকৃতি অতি মনোহর ছত্রের ন্যায়, একারণই এতজ্জাতীয় পদার্থ ছত্রক ও স্থানবিশেষে বেঙ্গের ছাতা বলিয়া আখ্যাত হয়। অসার বা গলিত প্রায় কাষ্ঠাদি, জলসিক্ত অপরিষ্কৃত ভূমি, দুরিত গোময়স্তূপ, এবং জীবজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের অপর নানা প্রকার ধ্বংসাবশিষ্ট ও বিকৃত অংশের উপরে সাধারণতঃ ছত্রক জাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মিয়া থাকে। পতিত ক্ষেত্রে ও সাধারণ জঙ্গলময় ভূমিতেও কচিৎ জন্মিতে দেখা যায়। যদিও অপর উদ্ভিদের ন্যায় প্রকৃত বীজ হইতে ইহার যথারীতি উৎপত্তি হয় না, তথাপি বীজোপম এক প্রকার অণুপ্রমাণ বস্তু বিশেষ হইতেই ছত্রক জন্মিয়া থাকে। ছত্রকের উৎপত্তি প্রণালী অতীব অদ্ভুত। ইহার অণুপ্রমাণ বীজ যত সত্বর বর্দ্ধিত হয়, আর কোনও উদ্ভিদ্ তত স্বল্প কালে বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায় না। রজনীতে যে স্থানে ছত্রকের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না, অনেক সময় প্রত্যূষে তথায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত বা তদপেক্ষাও বৃহৎ ছত্রকের অস্তিত্ব নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

ছত্রকের কারুকার্য্যও সামান্য বিস্ময়কর নহে। শিল্পের সূক্ষ্মাংশ পরিত্যাগ করিয়া স্থূল শোভার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অপরাপর উদ্ভিদের সহিত ইহার মূল এবং কাণ্ডের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু উপরিভাগের ছত্রাকৃতি ও তাহার মনোহারিত্ব দেখিয়া ইহাকে উদ্ভিদ্ বলিয়া কোনও রূপে অনুমান করা যায় না; সুনিপুণ কারুকরের যত্ন নির্ম্মিত মনোহর ক্রীড়নক বলিয়াই ধারণা হয়। বৃহদাকার ছত্রকের সুন্দর শিরোভাগ কত মনোজ্ঞ, তাহার ন্যুব্জ অধঃপৃষ্ঠায় সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত ফলক সমূহ কিরূপ মনোহর এবং তৎসংলগ্ন জালবৎ সুদৃশ্য ঝালর শ্রেণীই বা কেমন সুন্দর অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। ছত্রকজাতীয় উদ্ভিদ্ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন কোন প্রকার ছত্রকের উপাদান উগ্র বিষবৎপদার্থ, আবার কোন কোন প্রকারে মনুষ্যের আহারোপযোগি বস্তুও যথেষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। পাতাল কোঁড়ক নামক ছত্রকজাতীয় উদ্ভিদ্ অনেকে ব্যঞ্জনাদির সহিত সাদরে ভক্ষণ করেন; উহাতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর পদার্থ বর্ত্তমান আছে।

সকল প্রকার ছত্রকের সৌন্দর্য্য-গৌরব সমান নহে; কাহারও সৌন্দর্য্য নিতান্ত হীন, কাহারও সৌন্দর্য্য নিরতিশয় মনোরম। অষ্ট্রেলিয়ার নদী তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে, ব্রেজিল ও আণ্ডামান দ্বীপে এবং ইটালির দক্ষিণাংশে চারি প্রকারের বিভিন্ন শ্রেণীর ছত্রক জন্মিয়া থাকে। তাহা দিবসে যেমন মনোজ্ঞ রজনীতে তদপেক্ষাও অধিক শোভাবিশিষ্ট হয়। রাত্রি কালে তাহা হইতে এক প্রকার মনোহর জ্যোতিঃ বিনিঃসৃত হইয়া দর্শককে চমৎকৃত ও মোহিত করে। যে বনভাগে বা নদীতীরে উহা অধিক পরিমাণে

বিদ্যমান, তাহার শোভার ইয়ত্তা থাকে না; অনুমান হয় যেন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সহস্র সহস্র স্বর্ণ-পুষ্প কোন দৈব-আলোকে আলোকিত হইয়া অবিশ্রান্ত জ্বলিতেছে। অস্মদ্দেশেও কদাচিৎ ঐরূপ দীপ্তিশালী ছত্রক নেত্রগোচর হয়, কোন কোন পার্ব্বত্যপ্রদেশে ও ক্বচিৎ সাধারণ বনময় ভূভাগে উহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু উপরি লিখিত ছত্রকের ন্যায় এদেশীয় ছত্রকের দীপ্তি অত্যুজ্জ্বল ও রমনীয় নহে। অপরাপর স্থানের মধ্যেও অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের ছত্রকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্যোতির্ম্ময়।

জেম্‌স্ ড্রুমণ্ড্ নামক এক জন ভ্রমণকারী পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার সাবান নদী তীরে এক প্রকার ছত্রক দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। তাহা এরূপ উজ্জ্বল পরিষ্কার আলোক বিকীরণ করে যে, তৎসাহায্যে সংবাদপত্রাদিও সুন্দররূপে পাঠ করিতে পারা যায়। তথায় সাধারণতঃ এক একটি ছত্রকের ওজন প্রায় ৫ পাউণ্ড এবং পরিধি ১৬ ইঞ্চ পরিমাণ হইয়া থাকে। বার্কেল সাহেব আণ্ডামান দ্বীপে যে দীপ্তিশালিছত্রক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার আকার যদিও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিন্তু তাহারও আলোক অতিশয় চমৎকার। ঘোর তামসী রজনীতেও তাহার উজ্জ্বল প্রভায় বন-প্রদেশ প্রকাশিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন, এই সকল জ্যোতির্ম্ময় ছত্রকের অধিকাংশই বিষাক্ত, এবং উহাতে ফস্‌ফরাস্ নামক দীপকপদার্থের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে। ঈশ্বরের সৃষ্টি কত মনোজ্ঞ ও বিস্ময়কর পদার্থে পূর্ণ তাহার ইয়ত্তা নাই। যিনি এই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা

তিনি ধন্য; এবং যাঁহারা সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে স্রষ্টার সৌন্দর্য্য এবং সৃষ্ট বস্তুর বিবিধ বিচিত্র গুণ ও ক্রিয়ার স্রষ্টার অপার জ্ঞান ও অতুল মহিমা প্রত্যক্ষ করেন তাঁহারাও ধন্য!

ছত্রকের ন্যায় অন্য কোন কোন উদ্ভিদ্ হইতেও আলোক বিকীর্ণ হইতে দেখা যায়। এ দেশের কোন কোন অঞ্চলে এক প্রকার গুল্ম দৃষ্ট হয়, তাহার শিকড় জলসিক্ত করিলে আলোকময় হইয়া উঠে এবং জল শুষ্ক হইলে দীপ্তি তিরোহিত হয়। এরণ্ড জাতীয় কোন কোন উদ্ভিদের রস উত্তপ্ত করিলেও তাহা হইতে আলোক বাহির হয়। পরন্তু পৌষ্পিক আলোক সম্বন্ধে যাহা শ্রুত হওয়া যায় তাহাই অধিকতর বিস্ময় কর।

অনেকে বলেন কোন কোন ফুল বিশেষতঃ গাঁদাজাতীয় কয়েক প্রকার পুষ্প রাত্রিকালে দীপ্তিশালী হয়। কিন্তু উহা যে প্রকৃত পক্ষে পুষ্পের আলোক, তাহা অধিকাংশ উদ্ভিদ্বিদের মতবিরুদ্ধ। তাঁহারা বলেন উহা পৌষ্পিক-আলোক নহে; দর্শকের দৃষ্টির ভ্রম মাত্র, ঐ সকল পুষ্পের বর্ণভাতিই অল্পান্ধকারে ঐ রূপ উজ্জ্বল দেখায়। পরন্তু কিয়ৎকাল অতীত হইল বিবিধ সংবাদ পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছিল যে, আমেরিকার কোনও অরণ্যে এক প্রকার অদ্ভুত পুষ্প-বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার পুষ্প প্রকৃত পক্ষেই অতি পরিষ্কার আলোক বিকীরণ করে। যদিও এই আশ্চর্য্য তত্ত্ব অদ্যাপি বৈজ্ঞানিক মিমাংসায় সমর্থিত হয় নাই, তথাপি সৃষ্টির বিচিত্রতা অনুধাবন করিয়া ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয়।

পৌষ্পিক আলোক অলীক বিষয় বলিয়া যে সকল বিজ্ঞানবিদের ধারণা আছে, এই আবিষ্ক্রিয়া সত্য হইলে তাঁহাদের সে ভ্রম বিদূরিত হইবে। বাস্তবিক প্রকৃতির হস্তে বৈজ্ঞানিকদিগকে সময়ে সময়ে এইরূপ অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সৃষ্টিকর্ত্তার শক্তি অসীম, প্রকৃতি বহুরূপিনী, যত বহুদর্শন বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই স্বভাবের বিচিত্রতা—সৃষ্টবস্তুর বিবিধ গুণ ও ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়া বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মত মার্জ্জিত পরিপুষ্ট ও সংস্কৃত হইতেছে।

বিনয়।

মনুষ্য-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হয়, পরকীয় হৃদয়-রাজ্যে অধিকার বিস্তার করিতে মানবের চির আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাজের অবস্থা দৃষ্টেও দেখাযায়, পার্থিব জীবন অতিবাহিত করিতে গিয়া অপরের মনোবৃত্তির উপরে যিনি যত দূর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন, তিনিই সেই পরিমাণে নানা বিষয়ে সাংসারিক সুখ সুবিধা সহজে আয়ত্ত করিতে ক্ষমবান হন। বোধ করি এজন্যই প্রকৃতির শাসনে মানুষের মন অপর মানুষের মনকে আপনার করিতে নিয়ত শশব্যস্ত।

মনুষ্যের যাবতীয় কোমল মনোবৃত্তি এই প্রবল বাসনার সহায়। কখন কখন ক্রূর বৃত্তিগুলিও পরের মনোবৃত্তির উপরে কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে বটে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহার ফল স্থায়ী হয় না; এবং উহা দ্বারা সুখের পথে গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত হয়।

সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারা যায় এরূপও আর কিছু-তেই নহে। অথচ বিনয়ে বিনীত ব্যক্তির হৃদয়ের প্রচুর সৌন্দর্য্য ও বিলক্ষণ উন্নতি সাধিত হয়।

যে বৃক্ষ ফলভরে অবনত উদ্যানে তাহার শোভা বড়ই গৌরবজনক। মনুষ্য মুগ্ধনয়নে তৎপ্রতি দৃষ্টি করে এবং আনন্দিত হইয়া তাহার মূলে উপবেশন করে; ফল শূন্য উন্নত তরুর কর্কশ দৃশ্য লোকের তাদৃশ প্রীতিকর নহে। লোক সমাজেও যিনি বিনয়রূপ ফলভরে আপনা আপনি অবনত তৎপ্রতিই লোক সহজে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হয়; কিন্তু অহঙ্কারে উন্নত কঠোর স্বভাব মনুষ্যকে কেহই সমাদর করে না। বিনয়ে মনুষ্য-মনের সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধিত হয়; ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার মনের কোমলভাব গুলিকে দূর করিয়া দেয়, সুতরাং তদ্দ্বারা মানব-মনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। বিনয়ে সে মহান্ সৌন্দর্য্যের আরও স্ফূর্ত্তি হয়। মান-বের মুখ বাহ্য-সৌন্দর্য্যের প্রধান নিদর্শন, আবার উহা মনো-বৃত্তি সমূহের প্রতিকৃতি; সুতরাং মানসিক শোভায় শোভন বিনয়ীর মুখ স্বভাবতঃ কদাকার হইলেও আভ্যন্তরিক মাধুর্য্য-গুণে তাহা বড়ই প্রীতিকর দেখায়। সেই মানসিক মহত্ত্ব-জ্ঞাপক সুন্দর দৃশ্যের গৌরবে এবং তাহার সুমিষ্ট শীতল ব্যব-হারে লোক সহজেই তাহার অনুগত এবং তাহাতে অনুরক্ত হয়।

দুর্ব্বিনীত অহঙ্কারি ব্যক্তি মান হানি ভয়ে সর্ব্বদাই অপরের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়। উপযুক্ত স্থলেও মস্তক নত না করিয়া উন্নতশিরে অবস্থান করে; ক্ষণে ক্ষণে বক্র দৃষ্টিতে লোকের প্রতি বিষ বর্ষণ করে; সংসারকে তুচ্ছ

জ্ঞান করিয়া যেন আকাশে বিচরণ করিতেই আকাঙ্ক্ষা করে। তাহার ভঙ্গপ্রবণ সম্মানের উপরে আঘাত লাগিবে ভয়ে সে জনসমাজে অধিক ঘনিষ্ঠ হইতে চায় না; লোক-সমাগমে কখন মিলিত হইলেও এরূপ শঙ্কাকুলভাবে অবস্থান করে যে, তাহার তদানীন্তন গম্ভীর বিষাদ মূর্ত্তি দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়, কোন চিরস্থায়ী বেদনা হৃদয়-মূলে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অথচ এতদূর প্রয়াসেও সে লোকের নিকট প্রকৃত সম্মান লাভে সমর্থ হয় না। মনুষ্য যাহার প্রতি অনুরক্ত নহে তাহার সম্মান বর্দ্ধনে প্রস্তুত হওয়াও তাহাদের স্বভাব নহে। তবে সুখের বিষয় এই, সামাজিক কোন রূপ গুরুতর প্রভেদ বশতঃ অথবা ভয় ও স্বার্থসিদ্ধি প্রভৃতি কারণে অধীন অনুজীবী বা স্বার্থাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে যে কাল্পনিক মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া থাকে, উহারা তাহাকেই সম্মাননার উচ্চ আদর্শ জ্ঞান করিয়া অনেক সময়ে কৃতার্থ হয়। কিন্তু তাহারা জানে না যে, হৃদয়ের স্বতঃসিদ্ধ প্রীতি-প্রণোদিত সম্মান লাভের নিকটে উহা হীরকের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর কাচখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মানহানি বা ক্ষুদ্র বলিয়া পরিচিত হওয়ার ভয়ে দুশ্চিন্তা-নীত হওয়া নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতার কার্য্য। যে প্রকৃতপক্ষে হীন সে ব্যক্তিই আপনার মহত্ত্বের গীত আপনি গান করে। যাহার যে বস্তুর অভাব অনেক সময়ে সে ব্যক্তিই তাহার অধিকারী বলিয়া লোক সমক্ষে প্রচার করিতে ব্যগ্র হয়। কিন্তু মানবের চক্ষুঃ এতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী যে, যে কোন [illegible] লোক তাহা সহজেই চিনিয়া ফেলিতে সমর্থ [illegible]

ব্যক্তিকে যেরূপ অবস্থায়ই অবস্থাপিত কর না কেন তাহার মহত্ত্ব সমুদয় আবরণ ভেদ করিয়া অগৌণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে; তদ্রূপ যে ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে নীচ, তাহাকেও যতই উচ্চ আসন প্রদান কর না কেন, লোকের সম্মান-দৃষ্টি তৎপ্রতি অধিক কাল স্থির থাকে না। যেমন জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড বস্ত্রাবরণে আবদ্ধ থাকে না সেইরূপ নীচের নীচতা অথবা মহতের মহিমা কখনও কাল্পনিক উপায়ে আচ্ছন্ন রাখা যায় না। অতএব, অহঙ্কারের কৃত্রিম আবরণ মহতের পক্ষেও অনাবশ্যক, ক্ষুদ্রের পক্ষেও নিষ্ফল।

যাহারা অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতাশালী তাহাদের বিনয় ও শিষ্টাচারের কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলেও লোকে তৎপ্রতি অধিক ভ্রূক্ষেপ করে না; কিন্তু তেমন প্রসন্ন ভাগ্যশালী মনুষ্যগণও যথোচিত শিষ্ট ও বিনীত হইলে যেমন সম্যক্ লোকানুরাগ লাভ করিয়া বিপুল যশঃ কাঙ্ক্ষিত কৃতকার্য্যতা এবং অনুপম মানসিক সুখ লাভে সমর্থ হইতে পারেন, বিনয় ও শিষ্টাচার অভাবে তাহার সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধকতাই ঘটে।

অনেকে আশঙ্কা করেন, বিনয় মহত্ত্ব ও তেজস্বিতা বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বিশেষতঃ তাঁহারা বলেন তেজের সহিত বিনয়ের চির বিরোধ; যাঁহারা সুবিনীত তাঁহারা পর-পদ-সেবায় যশস্বী হইতে পারেন, কিন্তু পৌরুষ-কার্য্যে সফলতা লাভে সমর্থ হইবেন না। কিন্তু ইহা সেই অদূরদর্শীদিগের গুরুতর ভ্রম; বিনয়ে তেজের শোভা আরও বর্দ্ধিত হয়। বিনয় সৌন্দর্য্য, তেজ শক্তি; শক্তি আর সৌন্দর্য্য কি একত্র অবস্থান করিতে পারে না? বরং যাহাতে শক্তি

ও সৌন্দর্য্য উভয় বর্ত্তমান, তাহারই গৌরব অধিক ; শক্তি-বিহীন সৌন্দর্য্য ও সৌন্দর্য্যবিহীন শক্তি হেয় ও অস্বাভাবিক। উদ্ধত স্বভাব যুবকগণ মনে করেন, ঔদ্ধত্য আর তেজ এক পদার্থ। বস্তুতঃ উহা এক নহে। তেজস্বিতা বিকৃত হইয়া অনেক সময় ঔদ্ধত্যে পরিণত হয় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া উভয়কে এক বলা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। যিনি তেজস্বী, বিনয় তাঁহাতে অধিকতর সুন্দর দেখায়।

চৈতন্যদেব স্বহস্তে শিষ্যদিগের পদপ্রক্ষালন করিতেন, অথচ তিনি মানসিক শক্তি ও মহিমায় তুলনা রহিত। অদ্যাপি তিনি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকট ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন। মোগল সম্রাটদিগের শিরোভূষণ আকবরসাহ অতিশয় বিনয়ী ছিলেন। তিনি পরাজিত ভূপতি-বর্গের প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এবং সর্ব্বসাধা-রণের প্রতি এতদূর শিষ্টাচারী ছিলেন যে, সেই মহোদয় যবন-ভূপতিকে আজিও জাতিনির্ব্বিশেষে অনেকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করে ; অথচ তিনি প্রতাপে অদ্বিতীয় ছিলেন, প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষ তাঁহাকে নিজবলে অধিকার করিতে হয়। বাল্যকালেই আত্ম ক্ষমতায় অনেক প্রধান যুদ্ধে বিজয়-গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। বীরকুলাগ্রগণ্য নেপোলিয়ান বোনাপার্টিও যারপর নাই বিনীত ছিলেন ; তিনি পুনঃ পুনঃ পরাজিত রাজগণ সমীপে, অতি কাতর ভাষায় যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছেন তাহাতে বিনয় ও শিষ্টা-চারের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। নেপোলিয়নের ন্যায় আর কোনও বিজেতা বিজিতের প্রতি তেমন [illegible]

করিতে পারেন কি না সন্দেহ। বোনাপার্টির ন্যায় পৌরুষ-গুণসম্পন্ন মহান্ ব্যক্তি জগতে অল্পই দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ বিনয় পৌরুষের বিরোধী নহে; উভয়ের সম্মিলন অতিশয় মনোহর।

পুস্তক পাঠ দ্বারা বিনয় অভ্যস্ত হয় না। উপদেশেও কাহাকে বিনীতব্যবহার শিক্ষা দিতে পারা যায় না; বিনীত হইতে হইলে শিষ্ট ও বিনীত লোকেরা অপর সাধারণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন তাহাই অনুধাবন করিয়া দেখিতে হয়। বিশেষতঃ লোকের সহিত ভদ্র ও বিনীত ব্যবহার করিব এরূপ আকাঙ্ক্ষা নিয়ত মনোমধ্যে জাগরূক থাকিলে আপনা হইতেই তথাবিধ আচরণ অভ্যস্ত হইয়া আইসে।

বিনয় স্বার্থ লাভের অদ্বিতীয় সহায়। কিন্তু যাহারা স্বার্থ-চিন্তায় কপট বিনয়ে বিনীত হয়, তাহারা মনুষ্য মধ্যে অধম; জ্ঞানিগণ তাহাদের কিছুমাত্র গৌরব করেন না। বিনয়ের জন্যই বিনয়ী হইবে, বিনীত ব্যবহার প্রত্যেকের কর্ত্তব্য এজন্যই বিনীত ব্যবহার করিবে, স্বার্থ-সাধন জন্য নহে। স্বার্থের কুহকে মনের ক্রূরভাব গোপন রাখিয়া যাহারা বিনয়ীর কৃত্রিম বেশ পরিধান করে, অথবা আপনার মনুষ্যত্ব পরের পদে উৎসর্গ করিয়া পর-পদসেবায় রত থাকে, তাহারা ধূর্ত্ত এবং কাপুরুষ। তাহারা কপট বিনয়ে আপনাদের মনের গরলময় ভাব দীর্ঘকাল আবৃত রাখিতেও পারে না। যখন তাহাদের প্রকৃত পাপমূর্ত্তি লোকে চিনিতে পারে, তখন সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

যদি কোন কপট শিরোমণি চতুর পুরুষ মনুষ্যের নিকট চিরকাল আত্মগোপন করিয়া থাকিতে সমর্থও হয়, তথাপি তাহার মনের মহত্ব ও স্বভাবের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। যেহেতু, যে ব্যক্তি স্বার্থসাধন জন্য বিনীত হয় তাহার ন্যায় অন্যায় বিচার থাকে না। তাহার জিহ্বা পরের মনোরঞ্জন জন্য অকুণ্ঠিত ভাবে মিথ্যা কথা বলে, দৃষ্টি সর্ব্বদাই দীনতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করে; আপনার মহত্ব বিস্মৃত হইয়া সে সর্ব্বতোভাবে পরের চরণে আত্মবিক্রয় করে, পরের মনোরঞ্জন জন্য অম্লানচিত্তে অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠানেও রত হয় এবং ক্রমে চাটুকারিতাই তাহার একমাত্র ব্যবসায় হইয়া দাঁড়ায়। ঈদৃশ অবিবেকী আত্মসম্মান বিহীন ব্যক্তি কৃত্রিম বিনয়ে অবনত হইতে হইতে প্রকৃতপক্ষে যারপর নাই নষ্ট হইয়া যায়। পরিশেষে সেই ঘৃণিত অধঃপতন হইতে তাহার উদ্ধারের কোনও উপায় থাকে না।

বিনয় অতি প্রধান গুণ, কিন্তু চাটুকারিতা মহা দোষ এবং চাটুকার মনুষ্য মধ্যে অধম। যাহারা আত্ম-সম্মান ও নিজের ঈশ্বরদত্ত অমূল্য স্বাধীনতা পরপদে বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বতো-ভাবে পরকীয় ইঙ্গিতে পরিচালিত হয় এবং বিবেকের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব্বদা পরের অনুগ্রহ লাভাকাঙ্ক্ষায় লালা-য়িত থাকে, তাহারা যে নিতান্ত হীনচেতা কাপুরুষ ইহাতে আর কি সন্দেহ হইতে পারে? কিন্তু যিনি অপরের মনো-রঞ্জন করিতে গিয়াও নিজের মহত্ব অবিচলিত রাখিতে পারেন, পরের পদসেবা করিতে গিয়াও মনুষ্যত্বের [illegible] সেরা মূল্যবান্ সম্পত্তি স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে [illegible],

সত্যের প্রশংসা করিতে গিয়াও ন্যায়-নিষ্ঠা এবং সত্য পর-তার সীমা লঙ্ঘন না করিয়া আপনার গৌরব অবিচলিত রাখিতে ক্ষমবান হন তিনিই প্রকৃত প্রশংসার্হ এবং তাঁহার তথাবিধ মহৎ আচরণই বিনয়ীর পক্ষে প্রকৃত আদর্শ স্থানীয়।

উপজীব।

জীব-জগতে বিশ্বপতি পরমেশ্বর যে অদ্ভুত মহিমা এবং যে সকল বিচিত্র কৌশল প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন উপ-জীবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইবে। জীবশরীরে বসতি করা যে সকল প্রাণীর স্বভাব তাহাদিগকে উপজীব আখ্যা প্রদান করা গেল।

অধিকাংশ জীবদেহেই কোন না কোন প্রকার উপ-জীব কোন না কোন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উপজীবদিগের দেহেও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর উপজীবের বাস দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপজীবগণ যে সকল প্রাণিশরীরে বসতি করে তাহাদিগের ঐহিক উপকরণ উদরস্থ করিয়াই প্রাণ ধারণ করে, সুতরাং উহারা যে আবাসীভূত জীবদেহের বিশেষ অনিষ্টকারক তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সকল উপজীব অনিষ্ট-কারক নহে। কতকগুলি উপজীব জীবগণের কোন কোন প্রাকৃ-তিক বস্তুর উপাদান বিশেষ, সুতরাং তাহারা [illegible]

অনিষ্টদায়ক নহে; তাহাদের অভাব অথবা অঙ্গবৈকল্য হইলেই বরং জীবগণের অনিষ্ট হয়। আবার কোন কোন প্রকার উপজীব জীবদেহের বিশেষ অনিষ্ট সাধন না করিয়া কেবল কোনরূপ শারীরিক আস্বাস্থ্য জ্ঞাপন করে মাত্র।

প্রকৃতি ভেদে উপজীবদিগের কোন কোন জাতি জীব-দেহের বহির্ভাগে, কতকগুলি বা অভ্যন্তর দেশে বসতি করে। আভ্যন্তরিক উপজীবদিগের প্রকৃতি, বংশ বৃদ্ধির নিয়ম এবং কোন কোন অবস্থায় জীব-দেহে প্রবেশোপায় অতীব কৌতুকজনক।

এক প্রকার মক্ষিকা আছে, পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে অশ্ব-মক্ষি নামে অভিহিত করেন; উহারা জীবনের প্রথম ভাগে ঘোটকের পাকস্থলী ভিন্ন অন্যত্র জীবিত থাকিতে পারে না। উহাদিগের শৈশব-খাদ্য এবং তদানীন্তন অপরাপর প্রয়োজনীয় বস্তু অশ্বের উদরে প্রচুর পরিমাণে রক্ষিত আছে। যে উপায়ে উহারা জন্ম ধারণের পূর্ব্বেই ঘোটকের উদরে উপনীত হয় তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য।

ঘোটকেরা আপনাদিগের দেহের যে যে স্থান লেহন করিতে সমর্থ, অশ্বমক্ষিকার প্রসবকাল উপস্থিত হইলে তাহারা অশ্বের গাত্রে সেই সেই স্থানে শত শত অণ্ড প্রসব করিয়া রাখে। একপ্রকার আটাল পদার্থ যোগে ঐ সকল অণ্ড অশ্ব-লোমের সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকে; অশ্বগণ দেহ লেহন করিতে করিতে অণ্ড গুলি লালা সহযোগে উদরস্থ করে। এই আশ্চর্য্য উপায়ে অণ্ড অশ্বের পাকস্থলীতে স্থাপিত হইয়া তথায় ক্রমে পরিপুষ্ট হয় এবং যথাকালে তাহা হইতে

মক্ষিকাশিশু জন্মগ্রহণ করিয়া অশ্বের উদরেই স্বাভাবিক পান আহারাদি প্রাপ্ত হইয়া বৰ্দ্ধিত হয়, উহারাই আবার অশ্ব-মলের সহিত ভূমিষ্ঠ হইয়া আপনাদের পার্থিব জীবনের কার্য্যাবলিতে রত হয়, এবং ঈশ্বরের অদ্ভুত কৌশলের সাক্ষ্য প্রদান করতঃ উহারাও কালে কুলক্রমাগত অধিকার-ভুক্ত অশ্বগাত্রে আপনাদিগের সন্তান সন্ততির জন্য যথারীতি বাস-স্থান নির্দ্দেশ করে।

দক্ষিণ আমেরিকা এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ সমূহে চিগো নামে আর একপ্রকার মক্ষিকা জাতীয় প্রাণীর বাস। গর্ভা-বস্থা উপস্থিত হইলে স্ত্রী চিগোগণ অলক্ষিত ভাবে মনুষ্যের নখ প্রান্তে ছিদ্র করিয়া প্রবিষ্ট হয়। ইহাদের আকৃতি অতি ক্ষুদ্র এবং যখন ইহারা নখপ্রান্ত ভেদ করিয়া অঙ্গুলি মধ্যে প্রবেশ করে তখন একপ্রকার সুখানুভব হইতে থাকে; সুতরাং অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সতর্ক হইতে না পারিয়া সহজেই ইহাদের গূঢ় আক্রমণে আক্রান্ত হয়। অঙ্গুলী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইহারা ক্রমেই বৰ্দ্ধিতায়ত হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলী স্ফীত হইয়া নিরতিশয় যন্ত্রণার আস্পদ হয়। ঐ সময়ে চিগোর উদরে বহু সংখ্যক অণ্ড বৰ্ত্তমান থাকে।

তত্তদ্দেশে অনেকে সূক্ষ্ম লৌহশলাকার সাহায্যে দক্ষতা-সহকারে চিগো বাহির করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যদেহ ইহাদের এতই প্রিয়তম নিবাস ভূমি যে, পুনঃ পুনঃ শলাকা-ঘাত করিলেও ইহাদিগকে সহজে স্থানচ্যুত করিতে পারা যায় না; অবশেষে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করিতে হয়। পরন্তু যদি ঐ সময়ে অনবধানতায় দুই একটি অণ্ড রহিয়া গেলে

তবে যাতনার শেষ হয় না। যত দিন অণ্ড স্বতন্ত্র জীবদেহে পরিণত হইয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বহিষ্কৃত না হয়, ততদিন রুগ্ন স্থান সুস্থ হয় না। অঙ্গুলী হইতে চিগো বাহির করিয়া না ফেলিলে প্রথমে অঙ্গুলী পরিশেষে সমগ্র হস্ত স্ফীত হয় এবং স্থানে স্থানে ক্ষত হইয়া নিরতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করে; পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া যাতনার অবসান করে।

এসিয়া এবং আফ্রিকার উষ্ণ প্রধান দেশে গিনিপোকা নামে আর একপ্রকার প্রাণীর বাস। উহারা সাধারণতঃ নদী পুষ্করিণী ও জলাভূমিতে বসতি করে। ইহারাও সময়ে সময়ে অলক্ষিত ভাবে মনুষ্যের চর্ম্ম ভেদ করিয়া দেহে প্রবেশ করে। প্রবেশ কালে কিছুমাত্র যাতনা অনুভূত হয় না। ইহারা চর্ম্মের অব্যবহিত নিম্নে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। গিনিপোকা স্থূলতায় সাধারণ সূত্রবৎ এবং দৈর্ঘ্যে ছয় বুরুল হইতে আট হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ইহারা মনুষ্য-দেহের পুষ্টিকর রস পান করিয়া জীবন ধারণ করে। যখন ইহারা আকারে অধিক বর্দ্ধিত হয়, তখন আক্রান্ত মনুষ্য-দেহের রক্ত দূষিত হইয়া মাংস পচিয়া যাইতে থাকে। অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উহারা দেহ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে চেষ্টা করে, তখন অগ্রে দেহের কোন স্থানে একটি স্ফোটক হয়, গিনি পোকার একটি প্রান্ত স্ফোটক-মুখে প্রকাশিত হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা কৌশল করিয়া বাহির না করিলে ইহারা স্বতঃ বহির্গত হইতে সক্ষম নহে। পরন্তু ইহাদের দেহ অতিশয় কোমল ও ভঙ্গপ্রবণ; বাহির করিবার সময় একাংশ ছিন্ন হইয়া অপরাংশ স্ফোটকাভ্যন্তরে

রহিয়া যাইতে পারে। ইহারা মনুষ্য দেহের এরূপ মারাত্মক ব্যাধির কারণ যে, চিকিৎসকের সুকৌশল সম্পন্ন সাবধানতায় নির্ব্বিঘ্নে বহির্গত না হইলে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন রক্ষা দুর্ঘট হইয়া উঠে।

আর কয়েক প্রকার উপজীবের অণ্ড কোননা কোন প্রকারে প্রাণিবর্গের রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শিরায় শিরায় ভ্রমণ করে, এবং যথাকালে তাহা হইতে শাবক সমুৎপন্ন হইয়া শিরার অভ্যন্তরেই কোনও অংশে বাসস্থান মনোনীত করিয়া অবস্থান করে। এইরূপে সময়ে সময়ে উহারা ধমনীর রক্ত সঞ্চার পথ অবরোধ করিয়া ফেলে। ইহারাও আক্রান্ত দেহের পুষ্টিকর রস আহার করিয়াই দেহ বৰ্দ্ধিত করে। এতজ্জাতীয় এক প্রকার উপজীব সময়ে সময়ে মনুষ্যের চক্ষু মধ্যে দৃষ্ট হয় এবং কখন কখন ঘোটকের চক্ষুও ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হয়।

উপজীবগণ এক জীব-দেহ হইতেও দেহান্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। পরম্পরিত রূপে দেহান্তর গমন হেতু সময়ে সময়ে উহাদের আকৃতি ও স্বভাবের অনেক বৈলক্ষণ্য সংঘটিত হয়।

সাধারণতঃ মৎস্য ও সরীসৃপগণের দেহে বিবিধপ্রকার উপজীবের বাস। মৎস্য মাংসাসী প্রাণিগণ খাদ্য বস্তু সহযোগে তদাশ্রিত জীব বা জীবোৎপাদক পদার্থ উদরস্থ করিয়া আপনাদের দেহে নানা প্রকার উপজীব সংগ্রহ করে।

অনেক সময়ে মূষিকের যকৃতে একপ্রকার উপজীবের বাস দৃষ্ট হয়; উহাদের আকার ক্ষুদ্র, মুখাবয়ব দীর্ঘ এবং শরীর

থলিয়ার ন্যায়। মার্জ্জারগণ ঐরূপ উপজীবাক্রান্ত মূষিক ভক্ষণ করিলে উহারা তাহাদের উদরে জীবন্ত প্রবেশ করিয়া, নূতন আকারে আপনাদের নূতন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। তাহাদিগের দেহাবয়ব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ফিতার আকৃতিবিশিষ্ট দীর্ঘ দীর্ঘ কৃমিতে পরিণত হয়।

জর্ম্মেণিদেশে একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃত শম্বূক বর্ত্তমান আছে। উহারা যে সকল স্থানে বাস করে, সচরাচর তথায় এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটেরও বাস দৃষ্ট হয়, ঐ সকল কীট জলের উপরে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়ায় এবং শম্বূকের পৃষ্ঠদেশে রাশীকৃতভাবে সংলগ্ন থাকে। তদ্দেশীয় কয়েক প্রকার পক্ষী ঐ সকল শম্বূক আহার করে, সুতরাং শম্বূকের সঙ্গে সঙ্গে তদবলম্বী কীটগণও তাহাদের উদরস্থ হয়। পক্ষীর উদরে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল অণুবৎকীট বৃহৎ বৃহৎ কৃমির আকার প্রাপ্ত হয়। তখন ঐ সকল কৃমিদেহে একটি চতুষ্কোণা-কার লাঙ্গুলের উদ্ভব হয়, ঐ চতুষ্কোণ লাঙ্গুলের চারিটি গ্রন্থি হইতে আবার অসংখ্য অণ্ড উৎপন্ন হয় এবং পক্ষিমলের সহিত জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহা হইতে সংখ্যাতীত কীটা-ণুর উদ্ভব হয়। শূকরগণ নানাবিধ জলজ কদর্য্যবস্তু আহার করে, তাহাদের আহার্য্যবস্তুর সঙ্গে ঐ সকল কীটাণু শূকর-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিতায়তন প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহারা শূকর মাংস আহার করিয়া থাকে, খাদ্য বস্তুর সহিত তাহাদের উদরে ঐ সকল কীট সহজেই প্রবেশাধিকার পায়। মানবদেহে উপনীত হইয়া আবার উহারা রূপান্তরিত ও বৃহৎ বৃহৎ ফিতার আকৃতি বিশিষ্ট

ক্রমিতে পরিণত হয়। রন্ধনকালে মাংসে অত্যধিক উত্তাপ প্রদত্ত না হইলে মাংসস্থিত ঐ সকল কীটাণুর জীবন বিনষ্ট হয় না ; সুতরাং যাহারা অনতিপক্ক মাংস উদরস্থ করে তাহারা এতজ্জাতীয় উপজীবকর্ত্তৃক অতি সহজেই আক্রান্ত হয়। উপজীবদিগের প্রকৃতি, বংশ বৃদ্ধি এবং দেহান্তরগতি বোধ করি এই সকল বিবরণ হইতে পাঠকেরা সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এবং প্রকৃতির অদ্ভুত কাণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন।

অব্যবস্থিততা।

সংসার এক বিস্তীর্ণ সাধন-ক্ষেত্র, এখানে কেহ দেশোন্নতির মহামন্ত্রে দীক্ষিত, কেহ স্বরস্বতীর মহা সাধনায় বিব্রত। কেহ ভগবদ্‌ভক্তি সম্বল করিয়া অপার্থিবপ্রেমে ডুবিয়া থাকিতে লালসান্বিত, কেহবা সংসারাসক্তি প্রণোদিত হইয়া ধন সম্পদ অথবা পদ মর্য্যাদায় সিদ্ধিলাভ করিতেই শশব্যস্ত। কিন্তু যিনি যে সাধনাই অবলম্বন করুন যদি সঙ্কল্পকালে চপলতা হইতে সাবধান হন এবং সম্পাদন সময়ে অস্থিরতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন তবে সিদ্ধি বিষয়ে নিশ্চিত হইতে তাঁহার অধিকার আছে।

সঙ্কল্পিত বিষয়ে যাহাদিগের নিষ্ঠা নাই তাহারা সকল বিষয়েই অব্যবস্থিত। অব্যবস্থিতের জীবন কি অসার এবং দুঃখময়। তাহার জীবন ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়। তাহার সঙ্কল্প মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বেশ পরিবর্ত্তন করে। অথচ সেরূপ

পরিবর্ত্তনের কারণ সে নিজেও অবগত নহে। সে দেখিতে পায় যে, তাহার সঙ্কল্প সকল ওতপ্রোত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তদবস্থায় তাহার কি কর্ত্তব্য কখন চিন্তা করে না; অথবা বিহিত উপায়ের অনুসরণ করেনা। এজন্যই সুব্যবস্থিত জ্ঞানিব্যক্তি যেমন প্রারম্ভ হইতেই জীবন সম্ভোগ করেন, অব্যবস্থিতের পক্ষে তাহা অসম্ভব হয়। সে বার বার জীবন আরম্ভ করে, কিন্তু জীবন সম্ভোগ করা তাহার ভাগ্যে অল্পই ঘটে।

দীর্ঘ জীবন লাভ অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে; অথচ দীর্ঘায়ুর জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও জীবনের গণনীয় ভাগ অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অসমর্থ শৈশব ও বাল্যজীবন এবং তথাবিধ বার্দ্ধক্যকাল পরিত্যাগ করিলে যে কিয়ৎপরিমিত কাল অবশিষ্ট থাকে তাহাই জীবনের কার্য্যকর সারভাগ। কিন্তু নিদ্রা, ব্যাধি, আলস্য ও বৃথাকার্য্যে যে প্রচুর সময় অতিপাত হয়, জীবনের সেই সারভাগ হইতে তাহা অন্তরিত করিলে প্রকৃত জীবনকাল অল্পই অবশিষ্ট থাকে। সেই অল্পমাত্রকাল যিনি কার্য্যের বন্ধনে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে না পারিলেন, তিনি নিতান্ত দুর্ভাগ্য। সেই অপব্যয়ীর পক্ষে দীর্ঘজীবন ও ক্ষীণজীবন উভয়ই তুল্য। পরন্তু যাহারা কার্য্যশীল হইয়াও অব্যবস্থিত তাহারা সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত হইয়া অমূল্য জীবন-ধন যেরূপ অপব্যয় করে এরূপ আর কেহই করে না। তাহারা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিলেও কালবক্ষে পদচিহ্ন স্থাপন করিয়া যাইতে পারে না, অতি বিস্তৃত জীবনোদ্যানে ভ্রমণ করিয়াও তাহারা কুসুম চয়ন করে

হয় না, তাহাদের সঙ্কল্প কখনও সফলতায় পরিণত হইতে পারে না। অথবা জীবনে তাহাদের সঙ্কল্পই স্থির হয় না। তাহারা পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে যদি কেহ তাহাদের মূল্যহীন জীবনের সমালোচনায় প্রবর্ত্ত হন. তবে বলিতে পারিবেন,— তাহারা জন্মিয়াছিল, বাঁচিয়া ছিল, এবং মরিয়া গিয়াছে। বোধ করি তদতিরিক্ত আর কিছুই বলিতে সমর্থ হইবেন না।

যাহার মত স্থির নহে, কার্য্য প্রণালী নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ নহে তাহাকে কেহই বিশ্বাস করে না। সে ব্যক্তি আপনিও আপনাকে সকল সময়ে বিশ্বাস করিতে সমর্থ হয় না। ন্যায়-অন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মও সেই অমিতাচারীর নিকট বিশ্বজনীন বলিয়া উপলব্ধি হয় না। এখন সে দেবতা মুহূর্ত্ত পরেই পিশাচের অধম; এই সে কোনও বিষয়ে অসাধারণ দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছে, মুহূর্ত্ত পরেই দেখিবে তাহার সেই প্রবৃত্তির মূল পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, আবার তৃতীয় মুহূর্ত্তে প্রবৃত্তি আছে কি না এবং ছিল কি না তাহাও সে বুঝিতে পারে না। এরূপ লোকও শক্তিশালী হইতে পারে বটে, কিন্তু কস্মিন কালেও তাহাতে শক্তির বিকাশ নাই; উপস্থিত মুহূর্ত্ত জন্য সে বিলক্ষণ চতুর ও সপ্রতিভ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার জীবনের কিছুমাত্র মূল্য নাই। সে পৃথিবীর অন্নরাশি ধ্বংস করিবে কিন্তু তাহা দ্বারা কোনও মঙ্গল সাধিত হইবে না। সে কোনও মূল্যবান সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না।

অব্যবস্থিতের জীবন সকল বিষয়েই বিষম। তাহার মনে শান্তি নাই, তাহার সুখ সৈকত-ভূমির ক্ষয়িত-মূল প্রাসাদ-

সদৃশ ; কখন যে ভূতলশায়ী হইবে স্থিরতা নাই। বহুরূপী যেমন ক্ষণে ক্ষণে বর্ণ পরিবর্ত্তন করে, তাহার মনোবৃত্তি সকলও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেইরূপ বিভিন্ন বেশ ধারণ করে। সে হাস্য-সহকারে শয্যা পরিত্যাগ করে, বিষাদ-ক্লিন্নহৃদয়ে মধ্যাহ্ন কাল অতিবাহিত করে। এই সে পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন বলিয়া স্পর্দ্ধা করে, আবার পরক্ষণেই যাতনার মর্ম্মুর-দাহনে দগ্ধ হইতে থাকে। বস্তুতঃ তাহার হাসিবারও কিছু নাই, কান্দি-বারও কিছু নাই ; সে উন্নতও নহে, অবনতও নহে ; তাহার প্রশংসাও নাই, নিন্দাও নাই। তাহার জীবন স্বপ্নের ছায়া ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।

অব্যবস্থিতের সহিত যাহার সম্পর্ক তাহারও সুখ এবং স্বস্তি নাই। অদ্য তাহার সৌহার্দ্দের শীতল ব্যবহারে তুমি পরম আপ্যায়িত হইতেছ, কিন্তু কল্যই দেখিতে পাইবে তোমার সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে। অথচ সে পূর্ব্বে তোমাকে কেন ভালবাসিত তাহাও জানে না এবং পরে যে কি জন্য ঘৃণা করে তাহাও জানে না। এক সময়ে সে যথেচ্ছাচারী প্রভু, আবার পরক্ষণে দাসবৎ বশতাপন্ন। কিন্তু তাহার সেই প্রভুত্ব যেমন উৎপাতজনক, সেইরূপ তাহার দাসত্বেরও কিছুমাত্র মূল্য নাই।

যাহার সঙ্কল্প নিয়ত বিতথ হইয়া যায়, যাহার কার্য্য-প্রণালী প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল তাহার বিবেক এবং অভিলাষ পদে পদে ধিকৃকৃত হয়। তাহার বিশৃঙ্খল জীবন কি হাস্যাস্পদ! সে মনোহর সৌধ-নির্ম্মাণে কল্পনা করে, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া নানা দেশ হইতে বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করে, হয়ত সংগ্রহ-

মাত্রই সার হয়। অথবা নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া এক বার এক দিক মনোহর স্তম্ভাবলিতে শোভিত করে, পরক্ষণে তাহা ভঙ্গ করিয়া সে স্থান প্রাচীর বেষ্টিত করিতে আরম্ভ করে; ক্ষণ পরে বিবেচনা করে, সে স্থানে প্রাচীর সন্নিবেশও সঙ্গত হয় নাই, তথায় সোপানরাজি বিন্যস্ত করিতে হইবে। পরিশেষে কিন্তু আর কিছুই হয় না। ইষ্টক প্রস্তরাদি স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া থাকে, সে তৎপ্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ভিন্ন বাসনায় অন্যত্র প্রস্থান করে। অথচ তাহার কার্য্যের পরিণাম আজিও যেরূপ কালিও সেই রূপ। হায়, এরূপ বিসদৃশ আচরণে তাহার মনে যথোচিত শোচনাও হয় না। সে মনে করে, যাহা করিতেছে তাহাই সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে; কিন্তু হৃদয়বান ব্যক্তি তাহার জীবনের দুর্দ্দশা দেখিয়া করুণায় অশ্রুপাত করেন।

কিন্তু বিচক্ষণ রাজমিস্ত্রির ন্যায় যাঁহারা অগ্রে বহু চিন্তা ও বহু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সঙ্কল্প স্থির করেন, করণীয় বিষয়ের অবিসম্বাদিত পরিষ্কার চিত্রপট অগ্রে অঙ্কিত করিয়া তদুপযোগী সাধনোপায় এবং কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করেন; এবং বিবেকের শাসন শিরোধার্য্য করিয়া সেই সকল উপায় ও প্রণালী শেষ পর্য্যন্ত অবিচলিত ভাবে অবলম্বন ও প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন; যিনি পূর্ব্বাহ্লের বাসনা অপরাহ্নে সফল হইবে আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ধীরভাবে সফলতার জন্য কাল-প্রতীক্ষা করেন, তিনি কিছুতেই অবসন্ন না হইয়া যশের উন্নত-স্তম্ভ অথবা অভিলাষানুরূপ সুখধাম অবাধে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

অতএব যদি কোন কঠোর সাধনায় সিদ্ধ হইয়া মূল্য-বান জীবনের অধিকারী হইতে আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে মতের চপলতা পরিহার কর। সপক্ষে ও বিপক্ষে বহুচিন্তা ও বহু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, মনের স্বাভাবিকী গতি এবং আপনার সর্ব্ব বিষয়িণী উপযোগিতা ধীরভাবে অনুধ্যান করিয়া প্রথমতঃ সঙ্কল্প স্থির কর। তৎপর কার্য্য-প্রণালীর কতকগুলি ন্যায় সঙ্গত সর্ব্বজনীন নিয়ম নির্দ্ধারণ করতঃ ইচ্ছার প্রবল-শক্তিতে বলীয়ান হইয়া ধৈর্য্য নির্ভীকতা ও উদ্যম সহকারে সিদ্ধির শৈল-শিখরাভিমুখে অবারিত-বেগে চলিয়া যাও, সঙ্কল্প অবশ্যই সাধিত হইবে। পরন্তু যদিও বিধির বিপাকে সফলকাম হইতে নাপার, তথাপি দুঃখিত হইও না, তোমার সাধু সঙ্কল্প হইতে পাদমাত্র বিচলিত হইও না, যে ন্যায়-সঙ্গত নিয়মাবলী তোমার অবলম্বিত কদাচ তাহার প্রতীপ-গামী হইও না। অনেকে অচিন্তিত রূপে বা অবৈধ উপায়ে কোনও মহৎ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই আপনা-দিগকে পরম গৌরবান্বিত মনে করেন; অল্প বুদ্ধি সাধারণ লোকেও সাধন-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র সিদ্ধি দেখিয়াই তাঁহাদের বিজয়-গৌরব গান করে, কিন্তু জ্ঞানিগণ সে গৌরব নিতান্ত অসার বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা সিদ্ধি অপেক্ষা সাধন প্রণালীর প্রতিই অধিক লক্ষ্য করিয়া থাকেন। অতএব তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পার আর না পার, তোমার সাধন প্রণালী যেন কদাচ কলঙ্কিত না হয়। এজন্যই পুনরায় বলিতেছি লোক-প্রশংসার বৃথা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া, অথবা অসহিষ্ণুতার পাপ মন্ত্রণায়

প্রতারিত হইয়া গন্তব্য পথ পরিহার করতঃ কখন হাস্যাস্পদ হইও না। পরন্তু শত শত জ্ঞানিব্যক্তির পরীক্ষিত সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করা যদি সঙ্গত হয়, তবে একথাও মনে রাখিবে যে, কালাতিক্রমে হইলেও সফলতা অবশ্যই তোমাকে ভজনা করিবে।

দৃঢ়ব্রতের জীবন কি গৌরবময়। তাঁহার সঙ্কল্প অবিচলিত, তাঁহার কার্য্য আদ্যোপান্ত প্রণালী বদ্ধ। তাঁহার প্রত্যেক ভ্রূভঙ্গীই উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল। এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রত্যেক কার্য্যই দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলার পাশে পরস্পর সম্বদ্ধ। তাঁহার প্রতি পদক্ষেপ অর্থযুক্ত, এবং প্রত্যেক চরণপাতেই তিনি জীবনপথের এক এক সোপান অতিক্রম করেন। তাঁহার গতি বাত্যা তাড়িত তৃণের ন্যায় অনিয়মিত নহে। আপনার গূঢ়মন্ত্র জপ করিতে করিতে তিনি ধীর পদবিক্ষেপে ভবিষ্যৎ ভেদ করিয়া সিদ্ধির মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি কোনও বাধা বিপত্তিকে গ্রাহ্য করেন না। যদি স্বর্গ মর্ত্ত্য উভয়ে তাঁহার পথ রোধ করে তথাপি তিনি গমনে বিরত হন না। বিঘ্নের বিপত্তিতে এবং মৃত্যুর বিভীষিকায় তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, উহাদিগকে বীর-পরাক্রমে দুই হস্তে দূরে নিক্ষেপ করিতে করিতে পৃথিবীর সমর-সঙ্কুল-পথ অবহেলায় অতিক্রম করেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞের হর্ষ-রঞ্জিত উন্নত বীর-মূর্ত্তি কি মনোহর! তাঁহার ললাটে সম্ভ্রম, আকৃতিতে স্থৈর্য্য, সর্ব্বাঙ্গে গৌরব এবং অন্তরে শান্তি চিরকাল বিরাজ করে।

টেলিফোন্ বা দূরশ্রবণ-যন্ত্র।

জগতে সৌন্দর্য্য, সৌকর্য্য, এবং চমৎকারিতা ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শি-মানব প্রকৃতির মহাগ্রন্থে যেমন সৃষ্টিকর্ত্তার অদ্ভুত জ্ঞানকৌশল ও মহিমার চিহ্ন দর্শন করিয়া অপরিসীম বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করেন এবং ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ প্রকৃতি পরিচর্য্যা হইতেই তাঁহারা পদার্থ সমূহের বিবিধ গুণ ও ক্রিয়া অবগত হইয়া নানাবিধ পার্থিব সম্পদের সৃষ্টি করতঃ মানব-সমাজের সুখ সৌকর্য্যেরও যুগান্তর উপস্থিত করেন।

বর্ত্তমান ইয়োরোপ ও আমেরিকার অধিবাসিগণ যে জগতকে কম্পিত করিয়া উন্নতির বিজয় ভেরী নিনাদিত করিতেছেন, বিজ্ঞান-চর্চ্চাই যে সেই প্রবল প্রভাবের প্রধানতম কারণ। তাঁহারা বিজ্ঞানবলে পর্ব্বতের পাষাণ-বক্ষ বিদারণ করিয়া, আকাশ পথের অগম্যতা পরাভূত করিয়া, সমুদ্রের পরাক্রমে উপহাস করিয়া, অগ্নিজল প্রভৃতি বাহ্যবস্তুকে আজ্ঞাবহ করিয়া, এমন কি বজ্র বিদ্যুৎকে পর্য্যন্ত করায়ত্ত করিয়া বাহ্যসম্পদের নূতন নূতন সোপান আবিষ্কার করিতেছেন এবং বলিতে গেলে আপনাদিগের রুচি অনুসারেই পৃথিবীকে পরিচালিত করিতেছেন।

তাড়িতের অদ্ভুত শক্তিপ্রভাবে যে শত শত মাইল

দূরবর্ত্তী স্থানে মুহূর্ত্ত মধ্যে সংবাদ বাহিত হইয়া থাকে তাহাও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরই মস্তিষ্ক পরিচালনার ফল। পরন্তু কিয়ৎকাল অতীত হইল সংবাদবাহক আর একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার কার্য্য আরও অদ্ভুত; তৎসাহায্যে পরস্পর বহু দূরস্থিত দুই ব্যক্তির মধ্যে অবাধে কথোপকথন নির্ব্বাহিত হইতে পারে। উহাই টেলিফোন বা দূরশ্রবণ-যন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। এস্থলেও তাড়িতের অসাধারণ শক্তিই মনুষ্যবুদ্ধির আয়ত্ত হইয়া বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় আশ্চর্য্যরূপে মানব-প্রয়োজন সাধন করিতেছে। আমেরিকাবাসী গ্রেহাম বেল্ নামক একজন বিজ্ঞান-বিশারদ পণ্ডিত এই অদ্ভুত যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন।

স্কটলণ্ডের অন্তর্গত এডিন্‌বরা নগর গ্রেহাম বেলের জন্মস্থান, কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকা দেশে তিনি উপনিবিষ্ট। বেল্ সাহেব বিজ্ঞানশাস্ত্রে একজন বহুদর্শী পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্ম্মাণে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁহাদ্বারা দূর-শ্রবণ-যন্ত্র ব্যতীত আরও বহুবিধ আশ্চর্য্য যন্ত্র উদ্ভাবিত এবং টেলিগ্রাফ ও অন্য বিবিধ যন্ত্রের নানারূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

দূর-শ্রবণ-যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার পর কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত অতি হীনাবস্থায় ছিল; ১৮৭৬ অব্দে ইহার বিলক্ষণ উন্নতি হয়, এবং তাহার পর হইতেই আশ্চর্য্যরূপে ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমে টেলিফোন যোগে অনধিক অষ্টাদশ মাইল দূরে শব্দ চালিত হইত; ১৮৮০ অব্দে চত্বারিংশৎ মাইল পর্য্যন্তও পরিচালিত হইয়াছিল; কিন্তু অল্প-

কাল মধ্যে এত অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কালে প্রায় পঞ্চশত মাইল দূরে অবলীলাক্রমে শব্দ পরিচালিত হইতে পারে। যেরূপ দ্রুতগতিতে এই যন্ত্রের উন্নতি সংসাধিত হইতেছে, তদ্দৃষ্টে আশা করা যায়, কালে আমরা যে কোন নিভৃত কক্ষে উপবেশন করিয়া এতৎসাহায্যে হয়ত সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলের অধিবাসীদিগের সহিত কথোপকথন করিতে সমর্থ হইব। এ আশাকে দুরাশা বলিয়া কেহ উপহাস করিতে পারেন না, কারণ সচরাচরই দৃষ্ট হইতেছে মানবমণ্ডলী যাহা কল্পনা করিতেও সাহসী হয় না তীক্ষ্ণমনীষী জ্ঞানিগণ তাহাই সাধন করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিতেছেন।

ভারতীয় জাতি বুদ্ধি ও প্রতিভায় কোনও জাতি হইতে হীন নহেন; কিন্তু বিজ্ঞান অবহেলার কুফল বশতঃ—আধুনিক যুগের কার্য্যকরী জ্ঞানার্জ্জনে অবহেলা করিয়া ভারতবাসী উন্নতির নিম্নতমস্তরে অবস্থান করিতেছেন। যাহাহউক উপাদেয় খাদ্য রন্ধন করা যদিও কষ্টকর কিন্তু তাহা উদরস্থ করা অতিশয় সহজ; সেইরূপ সত্যের আবিষ্ক্রিয়ায় যদিও বুদ্ধি নিয়োগের প্রয়োজন, কিন্তু আবিষ্কৃত জ্ঞানের উপলব্ধি অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধি লোকেরও সাধ্যায়ত্ত, তদ্দৃষ্টে তরুণবয়স্কদিগের অবগতি জন্য দূর-শ্রবণ-যন্ত্রের আকৃতি কার্য্যপ্রণালী ও শব্দ পরিচালনের কারণ সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

দূর-শ্রবণযন্ত্রে চোঙ্গার আকৃতি বিশিষ্ট দুইটি মূলযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। টেলিগ্রাফের তারের ন্যায় ধাতুময় অনতিস্থূল তার-

দ্বারা উভয় যন্ত্র সংযুক্ত থাকে। কার্য্যকালে যন্ত্রদ্বয়ের একটি বক্তার নিকট ও একটি শ্রোতার সমীপে রক্ষিত হয়। কখন কখন শব্দ শ্রবণ কালে দুই কর্ণে দুইটি যন্ত্রও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, পরস্পর যতদূর হইতে শব্দের আদান প্রদান প্রয়োজন তারটি তদনুরূপ দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। যন্ত্রের আকারও স্থানের দূরতা অনুসারে কিঞ্চিৎ বৃহৎ বা ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। কিন্তু সেই তারতম্য অতি সামান্য; যে যন্ত্র গুলির আকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সে গুলিও যুগল কর-পুটে অনায়াসে রক্ষিত হইতে পারে। দূরশ্রবণ যন্ত্রের চোঙ্গার ঠিক মধ্যভাগে একটি চুম্বক শলাকা সন্নিবিষ্ট এবং তাহার এক মুখের দিকে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চ ব্যাসের ছিদ্রবিশিষ্ট একটি গোলাকার কাষ্ঠময় চাকা সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। চাকার ঐ ছিদ্রের চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া অথচ অভ্যন্তরস্থিত ঐ চুম্বক শলাকার প্রান্তের অদূরে একখণ্ড অতি পাতলা সূক্ষ্ম লৌহ-পাত আবদ্ধ থাকে। চুম্বক শলাকার ঐ প্রান্তে আর একটি ক্ষুদ্রতর ও খর্ব্বাকৃত কাষ্ঠের চাকা নিবদ্ধ থাকে। প্রায় ৪০ হাত দীর্ঘ তাম্র তাঁরে উহা বহু সংখ্যক নিবিড় বেষ্টনে উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত থাকে। ঐ তাম্র তারের দুই বিভিন্ন প্রান্ত চাকার দুই পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়া চুম্বক শলাকার পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করতঃ অপর প্রান্তে চোঙ্গার দুইটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ রহে; এবং উহার কিয়দংশ চোঙ্গার বাহিরে প্রসারিত থাকে। যে অনতিস্থূল তারদ্বারা উভয় মূল যন্ত্র সংযুক্ত, এই সরু তাম্রতারের একটি তাহার সহিত সম্মিলিত, অপরটি ভূমির সহিত সংলগ্ন থাকে। এতদ্ব্যতীত দূর-শ্রবণ-

যন্ত্রে আর কিছুই নাই, এবং শব্দ পরিচালন কালেও আর কোনও বস্তুর আবশ্যকতা হয় না, অথবা কোন কৌশল প্রয়োগেরও প্রয়োজন পড়ে না। চোঙ্গার যে প্রান্তে লৌহ-পাত সন্নিবদ্ধ সেই প্রান্তটি অধরোষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়; এবং তারের অপর সীমাস্থিত দ্বিতীয় চোঙ্গার সেইরূপ প্রান্তটি কর্ণে লগ্ন করিয়া সমাগত ধ্বনি শ্রবণ করিতে হয়; এই মাত্র।

চুম্বকের নিকট লৌহ থাকিলে সেই লৌহ সর্ব্বতোভাবে চুম্বকের গুণ আয়ত্ত করে। দূরশ্রবণ যন্ত্রে যে লৌহপাত আবদ্ধ থাকে তাহা চুম্বকের অতি নিকটস্থ বলিয়া সর্ব্বতো-ভাবে চুম্বক-ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। পরীক্ষাদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, এক খণ্ড চুম্বক সহসা তার জড়িত আর একখণ্ড চুম্বকের নিকটে নিলে এবং অব্যবহিত পরে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সরাইলে এই অগ্র পশ্চাৎ গতি অনুসারে চুম্বক পরিবেষ্টিত ধাতু-তারে অগ্রপশ্চাৎ ভাবে তাড়িত-স্রোত প্রবাহিত হয়। টেলিফোন-যন্ত্রে শব্দ করিলেও শব্দজনক বায়ু-তরঙ্গের আঘাতে যন্ত্রান্ত-র্গত সূক্ষ্ম লৌহপাত কম্পিত হয়, তাহা হইলেই উহা একবার ঐ তার বেষ্টিত চুম্বক শলাকার নিকটস্থ হয় ও আর একবার যৎকিঞ্চিৎ দূরে চলিয়া যায়, এইরূপে অগ্র পশ্চাৎভাবে চালিত হওয়ায় চুম্বক-শলাকার অগ্রভাগপরিবেষ্টিত তাম্র-তারে তাড়িত-স্রোতের উদ্ভব হইয়া অগ্রপশ্চাৎভাবে তারের মধ্যে বাহিত হইতে থাকে। তাড়িত প্রবাহ ধাতু-দ্রব্যের মধ্য দিয়া অসাধারণ দ্রুতবেগে বাহিত হয়; সুতরাং উক্ত উপায়ে যন্ত্রান্তর্গত ধাতু তারে যে তাড়িত-

স্রোতের উদ্ভব হইল তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে তৎসংলগ্ন সুদীর্ঘ তারের অপর প্রান্তে চালিত হইয়া যায়। এবং ঐ শব্দ জনিত কম্পনে তথাকার যন্ত্রান্তর্গত লৌহপাতও কম্পিত হয়। এই কম্পন অপর প্রান্তস্থিত লৌহপাত কম্পনের ফলে সংঘটিত হয় বলিয়া তাহার সম্পূর্ণ অনুরূপ; সুতরাং যেরূপ শব্দ-কম্পনের অভিঘাতে প্রথম যন্ত্রের লৌহপাত কম্পিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় যন্ত্রান্তর্গত লৌহপাত কম্পনে সেইরূপ ধ্বনিই অবিকল সমুদ্ভূত হয়।

দূরশ্রবণযন্ত্রের সাহায্যে যেমন দূরদেশস্থিত দুই ব্যক্তির মধ্যে অনায়াসে বাক্যালাপ নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তদ্রূপ বক্তার প্রকৃত কণ্ঠস্বরও শ্রোতার অনুভূত হইয়া থাকে। এই অদ্ভুত যন্ত্রের সাহায্যে মনুষ্যগণ বহুদিবসের পথ দূরে থাকিয়াও যেমন প্রিয়তম বন্ধু বান্ধবের সহিত প্রকৃত কথোপকথন করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ প্রাণাধিক আত্মীয় পরিজনের মনোরম কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইতে পারেন; ইহা সামান্য সুখের বিষয় নহে। দূরশ্রবণ-যন্ত্র-যোগে কণ্ঠধ্বনির ন্যায় যন্ত্রাদির মধুরধ্বনিও দূর দূরান্তে বাহিত হইতে পারে।

এই অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া মানবসমাজের কিরূপ সৌকর্য্য সাধন করিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমেরিকার সুসভ্যজনপদ সমূহে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়। কারণ, যদিও অল্পকাল মধ্যেই এই যন্ত্র পৃথিবীর নানাস্থানে সভ্য দেশ সমূহে বাহুল্যরূপে প্রচারিত হইয়াছে তথাপি আমেরিকা খণ্ডেই ইহার ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই আশ্চর্য্য যন্ত্রের

সাহায্যে তত্রত্য অধিবাসীদিগের বিষয় কর্ম্মাদির এতাদৃশ অচিন্ত্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে যে, তাহার বিবরণ অবগত হইলেও সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। তথায় প্রতিনিয়ত সহস্র সহস্র টেলিফোনের কার্য্য চলিতেছে। এতৎ সাহায্যে তথাকার অধিবাসিগণ ঘরে বসিয়া দূরের বন্ধু বান্ধবের সহিত প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা কহেন; রাজকর্ম্মচারিগণ বিভিন্ন কার্য্যালয়ের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে নানাবিধ সাময়িক আজ্ঞা বিজ্ঞাপন করেন; পত্রিকার সংবাদদাতাগণ বহু-দূরে থাকিয়াও মুহূর্ত্ত মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রে সংবাদ প্রেরণ করেন; বাণিজ্যব্যবসায়ী গৃহে বসিয়া কিম্বা সমুদ্রবক্ষে ভাসমান থাকিয়া দূরস্থিত কর্ম্মচারীদিগকে নানারূপ বৈষয়িক ব্যাপা-রের উপদেশ দেন। এই দূর-শ্রবণ যন্ত্রযোগে সাধারণ অধি-বাসিগণ প্রতিবেশির সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, ভৃত্যদিগকে প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিয়োগ করেন, বিপণি হইতে দ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন; এইরূপে তথায় কথাবার্ত্তার নানাবিধ কার্য্য দূর-শ্রবণ-যন্ত্র যোগে সহজে সমাহিত হইয়া থাকে। এই অদ্ভুত যন্ত্রের সাহায্যে তথায় বিষয়কর্ম্মাদি সম্বন্ধে কিরূপ তুমুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, নিম্ন লিখিত বিবরণটি পাঠ করিলে সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কিছু দিন হইল এম, ডি, ওয়েভার নামে জর্ম্মেনি দেশীয় কোনও ভদ্রলোক ভ্রমণার্থ আমেরিকাখণ্ডে ইউনাইটেড্-ষ্টেট্স্ দেশে গমন করিয়াছিলেন, তিনি স্বচক্ষে তথায় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন।—

"আমি আমেরিকা দেশবাসী আমার কোন বন্ধুর আলয়ে

উপস্থিত হইয়াছিলাম, আমাকে দেখিয়া বন্ধুর সহধর্ম্মিণী সাতিশয় আনন্দিতা হইলেন। বহু দিনের পর আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি আমার জন্য নানারূপ আমোদ উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী কোন দূরবর্ত্তী স্থানে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন; অগৌণে টেলিফোন্ যোগে তৎসমীপে আমার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। তৎপর তাঁহাদের অশ্ব ও শকট আনয়ন জন্য টেলিফোন্ দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিলেন; শকট ও অশ্বশালা তাঁহাদের গৃহ হইতে কতিপয় মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তাহার পর টেলিফোন্ যোগে কোন এক জাহাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের সহিত এই কথাবার্ত্তা অবধারিত হইল যে, সে দিবস অপরাহ্নে আমরা তাঁহার যানে ভ্রমণ করিতে যাইব এবং রাত্রিতে তথায় আহার ও আমোদ প্রমোদ করিব। অধ্যক্ষ তখন বহু দূরে সমুদ্রবক্ষে অবস্থিত ছিলেন। তৎপর ৪০।৫০ মাইল দূরস্থিত তাঁহাদের কয়েকজন বন্ধুকে রাত্রির আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন, পরে দর্জ্জিকে বস্ত্র লইয়া আসিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং আরও বহুবিধ কার্য্য দূর-শ্রবণযোগে নির্ব্বাহিত করিলেন। তিনি ২০।২৫ মিনিটে এই সমূহ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, তাঁহার পাচকের নিকট টেলিফোন্ করিলেন, পাচক আবার টেলিফোন্ যোগে বিপণি হইতে নানাবিধ দ্রব্যজাত ক্রয় করিল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিল।" জর্ম্মেণিবাসী আরও লিখিয়াছেন যে, "ইহাঁরা দূরশ্রবণ-যন্ত্র সাহায্যে ৪০ মিনিটে যে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন, তাহা ৪০ ঘণ্টার ন্যূন সময়ে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব

ছিল। অধিকন্তু তাহাতে বহু লোক জনের আবশ্যক হইত এবং অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইত।"

যাহাহউক এই যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী এত সহজ এবং ইহার ব্যবহার এরূপ স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয় যে, এ কথা সাহস-পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কালে আমাদের দেশেও ডাকের বাক্সের ন্যায় পল্লীতে পল্লীতে দূর-শ্রবণ-যন্ত্র স্থাপিত হইবে; এবং অনেকে অনেক সময়ে ডাকে পত্রাদি না লিখিয়া তারে কথোপকথন করিয়া অপার আনন্দ ভোগ ও অল্প সময়ে সহজে বিবিধ প্রয়োজন সাধন করিতে সমর্থ হইবেন।

পৃথিবীর কার্য্য দেখিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, মনুষ্য-বুদ্ধির অসাধারণ শক্তি; সৃষ্টবস্তু মানব বুদ্ধির আজ্ঞাধীন। জ্ঞানিগণ যাহা মনে করিতেছেন বিজ্ঞানবলে সৃষ্টবস্তুর সাহায্যে তাহাই সম্পন্ন করিয়া উঠিতেছেন। কালে যে বিজ্ঞা-নের কতদূর প্রভাব বর্দ্ধিত হইবে এবং মনুষ্য কত অসাধ্য সাধনে সমর্থ হইবে তাহা কল্পনার অতীত। অজ্ঞ লোকে যাহা হেলা করিয়া দুই পায় দলন করে, জ্ঞানিগণের আশ্চর্য্য-বুদ্ধি-কৌশলে তাহা হইতেই স্বর্ণ প্রসূত হইতেছে।

রাজপুত-মহিমা।

অতীতের অদূরবর্ত্তীকালে যে সকল ভারতীয় জাতি বীর-গৌরবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে রাজপুতগণ অগ্রগণ্য। শীখ এবং মহারাষ্ট্র জাতির যশোভাতি যদিও

এক সময়ে জগৎকে চমকিত করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিকূল বায়ুবলে সে উজ্জ্বল দীপ অল্পকালেই নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, রাজপুত জাতির গৌরব তেমন ক্ষণস্থায়ী নহে; নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ঐ জাতি বীরগৌরবের উন্নত গ্রামে অবস্থান করিয়াছিল।

রাজস্থানে বীর-ধর্ম্মাক্রান্ত শত শত মহাপুরুষ এবং মহিমান্বিতা রমণী জন্মধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের জীবনচরিত ঐতিহাসিক এবং চরিতাখ্যায়ক উভয়েরই প্রলোভনের সামগ্রী। কবিগণও রাজপুত ইতিহাসরূপ মহাসাগরে প্রবেশ করিয়া চরিত্র ও ঘটনার সুন্দর সুন্দর রত্নরাজি সঙ্কলন করতঃ মনোরম কাব্যহারে মাতৃভাষার কণ্ঠভূষা সম্পাদন করিতে চিরকাল আগ্রহান্বিত। বাস্তবিক রাজপুত ইতিহাসের সত্য ঘটনা উপন্যাসের অদ্ভুত কাহিনীকেও হীনপ্রভ করে এবং রাজপুতের বিচিত্র চরিত্র কবির কল্পনাজাত মাধুরীকেও পরাভূত করে।

রাজপুতের বিচিত্র জাতীয় চরিত্রের মহাদোষ অথবা মহদ্গুণ, কিম্বা তাঁহাদিগের ঘটনাবহুল ইতিহাসের সমালোচনা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অবতারিত হইবে না। তজ্জাতীয় প্রধান মানবগণের ব্যক্তিগত চরিত্র অথবা কীর্ত্তি কলাপের বর্ণনও এস্থলে উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু ঐ গৌরবান্বিত জাতি বীরত্ব মহিমায় কতদূর মহীয়ান হইয়াছিল, সর্ব্ব-শোধিনী প্রকৃতি নির্ব্বাপিত আর্য্যবীর্য্যের স্ফুলিঙ্গমাত্র গ্রহণ করিয়া বহুকালের সাধনায় কিরূপ ভাস্বর দীপ্তির উৎপাদন করিয়াছিল তাহারই সামান্যমাত্র পরিচয় প্রদর্শন জন্য রাজপুত জাতীয় মহাপ্রাণ-

বালকবর্গের এবং মহীয়সী রমণীবৃন্দের গৌরবাত্মক বীরকীর্ত্তি এবং অদ্ভুত আত্মোৎসর্গ সমূহের মধ্য হইতে দুই একটির সংক্ষেপ বিবরণ এস্থলে গৃহীত হইল। যে জাতির বালক এবং মহিলাবৃন্দও মহত্ত্বের ঈদৃশ অদ্ভুত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন সেই জাতি যে কতদূর মহিমান্বিত হইয়াছিল সহজেই অনুমিত হইতে পারিবে।

কর্ম্মদেবীর অদ্ভুত কীর্ত্তি।

সর্ব্বনাশকর অন্তর্ব্বিপ্লব এবং জ্ঞাতিবৈরিতা হইতে ভারত-ভূমি কখনও মুক্ত হইতে পারে নাই। বৈদেশিক আক্রমণ সময়েও ভারতীয় রাজন্যবর্গ পরস্পর শত্রুতা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, বরং তদবস্থায় একে অন্যের সর্ব্বনাশের অধিকতর সুযোগ করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সর্ব্বনাশই সাধন করিয়াছেন। ক্ষমতার ত্রুটি বশতঃ কোন কালেই ভারতবাসিগণ পরপদানত হন নাই, কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহারই তথাবিধ শোচনীয় অধঃপাতের কারণ। আফ্‌গান-বীর সাহাবুদ্দীন গোরীও এই মহাসুযোগ আশ্রয় করিয়াই ভারতবর্ষে আপতিত হন এবং আর্য্যভূমে মোসলমান প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন সাহাবুদ্দীন ভারতবর্ষে উপনীত হন, তখন পৃথ্বীরাজ ভারতের সার্ব্বভৌম অধিপতিরূপে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। কিন্তু ভূপালবর্গের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে সার্ব্বভৌম বলিয়া স্বীকার করিতে

কুণ্ঠিত ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার মাতৃশ্বসৃ-সূত কান্যকুব্জ-পতি জয়পাল তাঁহার প্রবল প্রতিযোগী ছিলেন। পাপবুদ্ধি-প্রণোদিত জয়পালের আহ্বানেই সাহাবুদ্দিন পৃথ্বীরাজের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে স্বদেশীয় বহুসংখ্যক পরাক্রান্ত সৈন্য সমভি-ব্যাহারে ভারতবর্ষে সমাগত হন। কিন্তু দিল্লীর উপযুক্ত অধীশ্বরের ও মিবারাধিপতি সমরসিংহের একীকৃত বলের নিকটে গুরুতররূপে পরাভূত হইয়া সেবার তাঁহাকে পলায়ন করিতে হয়। কিয়ৎকাল অতীত হইলে সেই গুরুতর অপমানের প্রতিশোধ দান জন্য অধিকতর আয়োজন সহ-কারে তিনি পুনরায় বীর-বিক্রমে ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন। এবারও পৃথ্বীরাজ প্রিয়বন্ধু সমরসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং তিনিও অম্লান চিত্তে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অচিরে স্বাধীনতা রক্ষার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দিল্লী ও মিবারের পরাক্রান্ত বীরগণ দৃশদ্বতী তীরে সমবেত হইলেন। কিন্তু বিজয়-লক্ষ্মী এবার আর্য্যবীর দিগকে বঞ্চনা করিলেন। কুটবুদ্ধি প্রবঞ্চক আফ্গানের প্রবঞ্চনায় পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও শৃঙ্খলবদ্ধ হইলেন। সমরসিংহ অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া সমর শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র কল্যাণ এবং দেশহিতে আত্মোৎসর্গী আরও অগণ্য ক্ষত্রি-য়ের পবিত্র দেহ দৃশদ্বতীর সৈকত ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইল।

বিজয়ী সাহাবুদ্দীন দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইয়া সহজেই যুধিষ্ঠিরের পবিত্র সিংহাসন অধিকার করিলেন। এবং অচিরে কাপুরুষ জয়পালের কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া পবিত্র মিবার ভূমি অধিকারের জন্য সমর সজ্জা করিলেন।

মোসলমানের কঠোর অত্যাচারে ভারতভূমি বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিল; যবন প্রতিনিধি কুতব রাজস্থানে সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া রাজপুতদিগের প্রিয়তম জন্মভূমি স্থানে স্থানে শোণিত-স্রোতে প্লাবিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যে রাজস্থান বীর্য্যবহ্নির বিলাশ-ভূমি তথায় কি আফগানদস্যুর কিছুমাত্র দণ্ড বিধান হইবে না? অচিরে এক বীরনারী পরলোকগত মহিমান্বিত স্বামীর অলৌকিক বীর্য্য-মত্তায় অণুপ্রাণিত হইয়া মহাশক্তিরূপে দেশবৈরীর বিরুদ্ধে উত্থান করিলেন। তিনি সমরসিংহের বিধবাপত্নী প্রাতঃ-স্মরণীয়া কর্ম্মদেবী। পতি-বিয়োগ-বিধুরা সতী মিবারের উত্তরাধিকারী শিশু পুত্র কর্ণের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য অনুমৃতা হইতে পারেন নাই। রাজপুত্রের শৈশব নিবন্ধন মিবারের শাসনদণ্ডও তিনিই তৎকালে পরিচালিত করিতেছিলেন। বৈদেশিক দস্যুর যুদ্ধযাত্রার বিবরণ শ্রবণে তিনি আহত ফণিনীর ন্যায় উত্তেজিতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার স্বামী-শোক দ্বিগুণিত হইল, এবং তদুপরি প্রাণাধিক পুত্রের ভবি-ষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় ও স্বদেশের স্বাধীনতা বিলোপ ভয়ে তাঁহার বীরহৃদয় অধিকতর প্রহত হইতে লাগিল। অগোণে সৈনিক ও সামন্তদিগকে আহ্বান করিয়া সমর সজ্জার অনুমতি দিলেন।

সমস্ত আয়োজন সুসম্পন্ন হইলে সৈন্যগণ সজ্জিত হইল। কর্ম্মদেবী স্বয়ং সেনা চালনভার গ্রহণ জন্য কোমল দেহলতা কঠিন লৌহবর্ম্মে মণ্ডিত করিলেন; কটিও কর শত্রু বিনাসন লৌহাস্ত্র-সমূহে সজ্জিত করিয়া অশ্বারোহণে রাজপুত-বাহি-

নীর অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন। মূর্ত্তিমতী করাল-মাধুরী শত্রু দলন জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইল। নয় জন ক্ষত্রিয় নৃপতি, এবং রাবৎ উপাধিধারী একাদশ জন সামন্ত সসৈন্যে তাঁহার অনুগামী হইলেন। অম্বরের নিকটবর্ত্তী ভূভাগে যবন-চমূর সহিত রাজপুতদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

কর্ম্মদেবী বিপুল সাহস ও বিক্রমে, অদ্ভুত রণনৈপুণ্যসহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কুতবুদ্দীন সৌন্দর্য্য-মণ্ডিতা ভীমাযুবতীকে রণচণ্ডীবেশে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া এবং তাঁহার অদ্ভুত রণাভিনয় অবলোকন করিয়া জয়াশায় নিরাশ হইলেন। তাঁহার বল ক্রমেই ক্ষয়িত হইতে লাগিল। অবশেষে সেই ভীম-পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং স্বয়ং আহত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করতঃ প্রস্থান করিলেন। এইরূপে দিল্লীর প্রথম যবনভূপতি ক্ষত্রিয় নারীর নিকট পরাভূত হইলেন। অতুলনীয় বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া সমরসিংহের বিধবাপত্নী চিতোররাজ্ঞী কর্ম্মদেবী রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি জগৎ সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন যে, প্রতিকূলতার নিষ্পেষণে পিষ্ট হইলেও ক্ষত্রিয় বীর্য্য-বহ্নি নির্ব্বাপিত হয় না; এবং মনোবল শারীরিক পশুবলকে পরাভূত করিয়া বিজয়ের বিঘ্ন-সঙ্কুল পথ অবহেলায় অতিক্রম করে।

পুত্ত এবং তাঁহার বীর-জননী।

চিতোরের শেষ উৎসাদনের সহিত বর্ণনীয় প্রস্তাবাংশের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, অতএব বিবরণের স্পষ্টীকরণ জন্য দুই

একটি ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস প্রদান করা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

চিতোরের নাম করিলেই তাহার অতীতের মহাগৌরব এবং তাহার সহস্র সহস্র বীর সন্ততির শোচনীয় আত্মোৎসর্গ যুগপৎ স্মৃতিসাগরকে আলোড়িত করিতে থাকে। চিতোর রাজস্থানের সীমন্ত-সিন্দূর, অথবা কণ্ঠমালার মনোহর মধ্য-মণি। উহা মিবার-জননী চতুর্ভুজার অধিষ্ঠানভূমি, উহা রাজপুত গৌরবের স্তম্ভ স্বরূপ মহারাণাগণের পৈত্রিক রাজধানী। সহস্র কারণে চিতোর রাজপুতজাতির প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। শত্রুর প্রবল উৎপাত ঝটিকা চিতোরের উপর দিয়া বারম্বার প্রবাহিত হইয়াছে; এবং সময়ে সময়ে তাহার সৌন্দর্য্য-রাশিও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু চিতোরের গৌরব এবং স্বাধীনতা রক্ষাজন্য হৃদয়শোণিত দান করিতে, কিম্বা যে কোনও প্রকার স্বার্থোৎসর্গ করিতে রাজপুত আবাল বৃদ্ধ বনিতা কোন কালেই কুণ্ঠিত হন নাই।

শত্রুর আক্রমণে তিনবার চিতোরের শাক অর্থাৎ মহা-উৎসাদন সাধিত হয়, তন্মধ্যে আকবর কর্ত্তৃক যে শেষ উৎ-সাদন সম্পাদিত হয় তাহাতেই চিতোরের অধিকতর অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছিল। তাহাতে চিতোর জনশূন্য মহাশ্মশানে পরিণত হয়, তাহার শোভনীয় প্রাসাদ স্তম্ভাদি বিধ্বস্ত এবং বিচূর্ণিত হয়। স্থানান্তর করিবার উপযুক্ত শোভন নগরোপ-করণসমূহ আকবর আপনার ভাবী নগরী আকবরাবাদ সজ্জিত করিবার জন্য হরণ করেন। কিন্তু মোগল সম্রাট চিতোরের বীরপুত্র এবং বীর্য্যবতী নন্দিনীগণের স্বাধীনতা ও জাতীয়

গৌরব একদিনের জন্যও হরণ করিতে সমর্থ হন নাই। চিতোরের সেই শোচনীয় অধঃপতন দিবসে তাঁহারা হৃদয়ের শেষ শোণিতবিন্দু দান করিয়াও শত্রু হস্ত হইতে মাতৃ-ভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য অলৌকিক উদ্যম প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন। পরিশেষে অপরিহার্য্য মোসলমান-দাসত্ব নিকট-বর্ত্তী হইলে শত্রুর হৃদয় স্তম্ভিত করিয়া, তাহাদিগের প্রলুব্ধ আকাঙ্ক্ষা চরণে দলিত করিয়া, সংসার-মায়ার দৃঢ়তর গ্রন্থি অবহেলায় কর্ত্তন করিয়া দলে দলে ক্ষত্রিয়গণ নিরা-পদ অনন্তধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। চিতোর বিজয়ীর করায়ত্ত হইল, কিন্তু চিতোরবাসিগণ কেহই তাঁহার পদানত হইল না; এখন ইহাকে বিজয় বলিতে হয় বল, পরাজয় বলিতে হয় বল।

আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে তদানীন্তন মহারাণা কাপুরুষ উদয়সিংহ যে ঘৃণিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তেমন দৃষ্টান্তের অভিনয় করিয়া মিবারের পবিত্র সিংহাসন আর কেহই কলঙ্কিত করেন নাই। উদয় সিংহ মোগল প্রতি-যোগীতার কঠোরতা অনুধ্যান করতঃ সপরিবারে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু তখনও মিবার বীরশূন্য হয় নাই। ক্ষত্রিয়গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সহস্র সহস্র রাজপুত অচিরে বদ্ধপরিকর হইলেন।

ইঁহাদের মধ্যে জয়মল ও পুত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ; এবং ইঁহারা উভয়েই চিতোরযুদ্ধে প্রচুর বীরত্ব-মহিমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের এবং তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী অপরাপর ক্ষত্রিয় বীরগণের অদ্ভুত বিক্রমে মোগল-সূর্য্য

মহাবীর আকবর ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অল্প সংখ্যক ক্ষত্রিয়বীর অগণিত দুর্দ্দমনীয় মোগল সেনাকে যেরূপ অদ্ভুত বিক্রমে ক্ষয়িত করিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে আকবর জয়াশায় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর কাপুরুষোচিত উপায়ে মোসলমানযোদ্ধা ক্ষত্রিয়বীর জয়মল্লের গুপ্ত-হত্যা সম্পাদন করিলে রাজপুত পক্ষ অনেক দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তখন কৈলবারপতি তরুণবীর পুত্ত তাহাদের প্রধান আশাস্থল হইলেন। তিনি চন্দাবৎ বীরগণের অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অতুল বীর্য্যে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজপুত ইতিহাসে কথিত আছে এই সময়ে পুত্তের বয়ক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র। ষোড়শ বর্ষীয় বীরবর পুত্ত এবং তৎপরিচালিত অপর ক্ষত্রিয় বীরগণ শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া, তাহাদের দূরভেদী অগ্ন্যস্ত্র সমূহের অব্যর্থ সন্ধান গ্রাহ্য না করিয়া করবাল এবং শূলহস্তে শত্রুদল মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগকে দলিত, মথিত, বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু অগ্ন্যস্ত্রধারী শতগুণ অধিক সেনার সহিত সম্মুখ যুদ্ধের শেষফল সহজেই অনুমিত হইতে পারে। দিনে দিনে ক্ষত্রিয়বীরগণের সংখ্যা এত অল্পতর হইয়া আসিল যে, চিতোর রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন রাজপুতগণের শেষ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন হইল। উৎকট জহরব্রত সাধনের আয়োজন হইতে লাগিল।

বীরগণ আর একবার শেষ উদ্যম করিয়া বিজয় লাভের চেষ্টা করিবেন, পরাজিত হইলে যথাশক্তি শত্রু বিনাশ করিয়া সমর শয্যায় শয়ন করিবেন। আর মহিলাগণ শিশু পুত্র কন্যা

সমভিব্যাহারে অনলকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া জাতি ধর্ম্ম এবং বংশগৌরব রক্ষা করিবেন। ইহাই জহর ব্রতের উদ্দেশ্য।

ষোড়শবর্ষীয় তরুণ-বীর পুত্ত মোগলের সহিত ঈদৃশ প্রাণান্তকর কঠোর যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, চিতোরের বিপদ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বীরধর্ম্মান্বিতা জননী অম্লানচিত্তে সন্তানের যুদ্ধযাত্রা অনুমোদন করিলেন। এদিকে পুত্ত চন্দাবৎ কুলের শাখা জগবৎগোত্রের গোত্রপতি, পিতার এক-মাত্র বংশধর; অল্পকাল হইল তাঁহার পিতা চিতোর রক্ষার্থ আত্মদান করিয়াছিলেন, এখন পুত্তের বিলোপে জগবৎ-গোত্রের দায়াদ বিলুপ্ত হইবে। মাতার ক্রোড় শূন্য হইবে। এ অবস্থায় তাঁহার জীবন তাঁহার বিধবা জননীর নিকট কত-দূর মূল্যবান্ সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা, রাজপুত জাতির গৌরব রক্ষা এবং রাজপুত-ললনাগণের ধর্ম্মরক্ষা অপেক্ষা রাজপুত রমণীর নিকট আর কোনও অনুরোধ গুরুতর হইতে পারে না। পুত্র এই সকল মহাব্রত উদ্‌যাপন জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন, মাতা অম্লান চিত্তে অনুমোদন করিলেন। পীতবসন পরি-ধান করিয়া অসি হস্তে যবন-সেনাসমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিতে অনুমতি দিলেন।

কিন্তু সেই কঠোর অনুমতির কঠোরতর শেষ ফল অনু-ধ্যান করতঃ আপনিও বীর-সজ্জায় সজ্জিতা হইলেন। অন্তঃ-পুর কুটিরে আবদ্ধ থাকিয়া বিলাপ করা অপেক্ষা, অথবা ধর্ম্ম-রক্ষার্থ অনলকুণ্ডে আত্মদান করা অপেক্ষা যথাসাধ্য শত্রু বিনাশ করতঃ সমরশয্যায় শয়ন করা বীররমণীর অধিকতর

আকাঙ্ক্ষিত হইল ; বহু সংখ্যক ক্ষত্রিয় রমণী এই বীর নারীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন, পুত্তজননী স্বহস্তে তাঁহার সুকুমারী পুত্র-বধূকে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিতা করিয়া তাঁহার অনুগামিনী করিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া তাঁহারা বীরগর্ব্বে চিতোরদুর্গ হইতে অবতরণ করিলেন। এবং উন্মাদিনী রণগীতি গাহিতে গাহিতে রাজপুত বাহিনীর অনুগামিনী হইলেন।

দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। নিরুপদ্রব অন্তঃপুর-সেবিতা সুখোচিতা সুকোমল-হৃদয়া মাতা দুহিতা ভগিনী সহধর্ম্মিণীদিগকে আজ যবনাক্রমণে উদ্বেজিতা হইয়া আপনা-দিগের সমক্ষেই সমর ভূমিতে অবতরণ করিতে হইল ; এই উত্তেজক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া লৌহকবচের অভ্যন্তরে রাজ-পুতদিগের বীরহৃদয় কিরূপ প্রহত হইয়াছিল, লৌহকবচ অপেক্ষাও সুদৃঢ় সহিষ্ণুতা-কবচে কিরূপ আসুরিক বীর্য্যে তাঁহারা আপনাদিগের অন্তর্বৃত্তি সমূহকে মণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভ্রূকুটি-ভীষণ অগ্নিময় কঠোরদৃষ্টি কিরূপে শত্রুর ভবিষ্যৎ সুখস্পৃহা সমূহকে দগ্ধ করিতেছিল তাহা হৃদয়বান লোক সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। সে সকল অবস্থা বর্ণযোজনায় প্রকাশ করা সহজ নহে।

অগৌণে মোসলমানদিগের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। উগ্রচণ্ডা ক্ষত্রিয় মহিলাদিগের তীক্ষ্ণ-অসীর অব্যর্থ-সন্ধানে শত শত শত্রুশির রণভূমিতে লুন্ঠিত হইতে লাগিল, সম্রাট আকবর এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত এবং মোহিত হইলেন। জীবন এবং সম্মানে আঘাত না করিয়া সিংহিনী দিগকে ধৃত করিতে বহু চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু জ্বলন্ত অঙ্গার-

খণ্ড কেহই গলাধঃকরণে সমর্থ হয় না। তাঁহার প্রয়াস সম্পূর্ণ বিফল হইল। শত্রুর হস্তে তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা হইল না বটে; কিন্তু তাঁহাদিগের সম্মান এবং গৌরব আপনাদিগের হস্তেই অক্ষুণ্ণভাবে সুরক্ষিত হইল, তাঁহারা সমরে আত্মদান করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

আজ পুত্তের প্রতাপে মৃত্যুরও বিভীষিকা উৎপন্ন হইল। চিতোরের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্ত গমনে উন্মুখ হইল, তদুপরি তাঁহার প্রীতির কুসুমাবলী শত্রু-করে মর্দ্দিত হইল; স্নেহ-ময়ী জননী, প্রাণাধিকা দয়িতা বিষম-সমরে আত্মদান করি-লেন; তাঁহার ইহজীবনের সকল আশা কাল-সাগরে মিশাইল, সকল বন্ধন ছিন্ন হইল। তিনি প্রতিহিংসা বিষে জর্জ্জরিত হইয়া আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় শত্রু কটকে পতিত হইয়া অব্যা-হত প্রতাপে শত্রু ক্ষয় করিতে লাগিলেন; পরিশেষে শত্রুর শবরাশির উপর আপনি চিরদিনের জন্য শয়ন করিয়া সকল দুঃখের শান্তি করিলেন। সেই দুর্দ্দিনে * চিতোর-রক্ষার্থ সম-বেত ক্ষত্রিয়বীরগণ সকলেই এইরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

শোণিত-কর্দ্দমিত পথ অতিক্রম করিয়া আকবর চিতোর প্রবেশ করিলেন; কিন্তু হায়, সুবিশাল চিতোর পুরী আজ মহাশ্মশানে পরিণত; আকবরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিবার জন্য একজন রাজপুতও আজ চিতোরে জীবিত নাই!

অপরিমিত অর্থরাশি বিসর্জ্জন দিয়া এবং সহস্র সহস্র পরাক্রান্ত সৈনিকের জীবন আহুতি দিয়া আকবর আজ মহা-প্রাকারবেষ্টিত জনপ্রাণিশূন্য এক সুবিশাল মহাশ্মশান

* সম্বৎ ১৬২৪ (খৃঃ ১৫৬৮) ১১ই চৈত্র রবিবার।

উপহার পাইলেন। রাজপুত জাতির শত দোষ থাকিলেও তাহাদের তুল্য স্বাধীনতার অনুরাগী এবং বীরত্ব-মহিমা-পূর্ণ জাতি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। স্বাধীনতা এবং স্বধর্ম্মের জন্য রাজপুতগণ যেমন অকাতরে জীর্ণবস্ত্রখণ্ডের ন্যায় দেহ বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্ল্লভ।

মহানুভাব মোগলভূপতি আকবর শত্রুর উপযুক্ত সম্মান করিতে জানিতেন। তিনি রাজপুতমহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া, বিশেষতঃ তরুণবীর পুত্ত এবং রাজপুতরমণীদিগের অদ্ভুত-কীর্ত্তি দর্শন করিয়া এত মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বীর-কীর্ত্তি অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে প্রতিমূর্ত্তি ও স্মরণ-চিহ্ন স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আপনার প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বারে উচ্চ মঞ্চোপরি বীরবর পুত্তের এবং চিতোর যুদ্ধের অপর প্রধান রণাভিনেতা জয়মলের দুই পাষাণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজপুত জাতির মহিমান্বিত মানবগণ মনুষ্যের হৃদয়মন্দিরে তদপেক্ষাও উচ্চতর মঞ্চে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পবিত্র শ্রদ্ধাভক্তি চিরকাল উপহার পাইবেন।

রাজপুত জাতির সুদিন চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা এখন মেষশাবকের ন্যায় নিরীহ এবং নিশ্চেষ্ট। বীরোচিত গুণগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে যদি রাজপুতগণ জ্ঞানালোচনায় এবং সময়ের গতি অনুসারে সভ্যতা বর্দ্ধনে সচেষ্ট হইতেন, যদি তাঁহাদের রাজ-নীতি ও সমাজনীতি পরিশুদ্ধ হইত, একতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যদি তাঁহারা মাতৃপদসেবায় রত থাকিতেন [illegible]

হইতেন, তাহা হইলে সাময়িক ঝঞ্ঝাবাত অতিক্রম করিয়া গৌরবের সৌধশিখরে অবশ্যই তাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ হইতেন। অতএব বিবেচনা করিতে গেলে আত্মকৃত পাপ-ফলেই তাঁহারা অধোগত হইয়াছেন। নানা কারণেই অধুনাতন ভারতবর্ষে জাতীয়-জীবনের অবসান হইয়াছে; কিন্তু যে দেশের এক নির্দ্দিষ্ট খণ্ডে অতীতের অদূরবর্ত্তিকালেও রাজপুতের ন্যায় মহিমান্বিত জাতির উদ্ভব হইয়াছিল, সে দেশের ভবিষ্যৎ যে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময়, ভবিষ্যদ্দর্শী ঐতিহাসিকের চক্ষুঃ এবং আশার কুহকলুব্ধ স্বদেশীর হৃদয় এ কথা কদাচ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে।

ক্ষুধা ও খাদ্য বস্তু।

ক্ষুধা প্রাণিবর্গের শারীরিক উপাদান পদার্থের সাময়িক অল্পতার পরিচায়ক। শরীরী জীবদিগের উপর ক্ষুধার যেমন প্রবল প্রভাব লক্ষিত হয়, আর কিছুরই তেমন দৃষ্ট হয় না। ইতর জন্তুর কথা ছাড়িয়া দাও, মনের মাহাত্ম্যে ও হৃদয়ের সৌন্দর্য্যে মনুষ্য সৃষ্টির প্রধান জীব, কিন্তু ক্ষুধায় অত্যধিক কাতর হইলে মনুষ্যেরও ন্যায় অন্যায় বিচার থাকে না। এমন কোনও দুষ্কর্ম্ম নাই, ক্ষুধার জ্বলন্ত বহ্নি নির্ব্বাপনার্থ লোকে যাহার অনুষ্ঠানে কুণ্ঠিত হইতে পারে।

ক্ষুধার প্রাবল্য সর্ব্বপ্রকার মনোভাবকে পরাভূত করে। মনুষ্যের মনোবৃত্তির উপর উহার কিরূপ অক্ষুণ্ণ পরাক্রম তৎ-প্রদর্শন জন্য একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে।

অল্পকাল অতীত হইল উত্তরকেন্দ্রের আবিষ্কারার্থী গ্রিলী এবং তাঁহার সহযাত্রিগণ যখন হিমানী প্রদেশে নানা বিপদে নিষ্পেষিত হইতেছিলেন, যখন খাদ্য বস্তুর অভাবে কেহ মৃত কেহ বা মৃতকল্প হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে এক বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় হয়। সেই নিরুপায় অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সবল কতিপয় ব্যক্তি রুগ্ন এবং মৃতকল্প কোন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাংসে উদর পূর্ত্তি করিয়াছিল।

ক্ষুধার জ্বালা অসহ্য হইলে দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তি অবাধে আত্মহত্যা করিয়াছে, পিতা মাতা স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিয়া হৃদয়ানন্দ প্রাণাধিক পুত্রকন্যার হসিতমূর্ত্তির আকর্ষণীকে তুচ্ছ করিয়া মুষ্টিমেয় তণ্ডুলের জন্য তাহাদিগকে পরহস্তে বিক্রয় করিয়াছে, স্বামী-স্নেহে অটল-বিশ্বাসবতী অঙ্কশায়িতা পত্নীর প্রেম-সুধাসিক্ত হাস্য-প্রদীপ্ত-নিদ্রিত-মুখমণ্ডলের দুশ্ছেদ্য মায়া কর্ত্তন করিয়া পতি তাহাকে শ্বাপদসঙ্কুল নির্জ্জন কাননে পরিত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু আসন্নমৃত্যু নিরুপায়-বন্ধুর হৃৎ-পিণ্ড ছেদন করিয়া আত্ম-পরিতৃপ্তির জন্য অম্লানচিত্তে তাহার রক্তমাংস উদরস্থ করা, মানবের মন এবং হৃদয়ের, বিবেক এবং ধর্ম্মের তৎসমুদয় অপেক্ষাও কত গুরুতর অধোগতির পরিচায়ক আমরা কল্পনা করিতেও অসমর্থ।

যাহা হউক ক্ষুধা সময়ে সময়ে ঈদৃশ অকল্যাণ সংঘটন করিলেও স্বভাবতঃ উহা মনুষ্যের অনিষ্টের কারণ না হইয়া বিবিধ মহোপকারই সাধন করে। ভোজন-স্পৃহা এবং ভোজনের প্রয়োজন না থাকিলে মানব-সমাজের বর্ত্তমান

সৌষ্ঠব ও গৌরব কখনই প্রত্যক্ষ হইত না। লোকে নানা উদ্দেশ্যে বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হয়, কিন্তু অধিকাংশের মূলে ক্ষুধার প্রভাব গূঢ় কারণ রূপে বিদ্যমান থাকে।

জীবিত পদার্থ মাত্রেরই ক্ষয় বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। আমাদিগের শরীরেরও প্রতিমুহূর্ত্তে নানা কারণে তেজো-হ্রাস ও উপাদান পদার্থের ক্ষয় হইয়া থাকে; আহার্য্য বস্তুর সহিত পুষ্টিকর পদার্থ শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে সেই ক্ষতি পরিপূরিত ও দেহ সংবর্দ্ধিত হয়। যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম উক্ত ক্ষয়ের কারণ। রক্ত-প্রবহন, চক্ষুঃ-সঞ্চলন প্রভৃতি সামান্য সামান্য স্বাভাবিক ক্রিয়ায়ও এ ক্ষতি সংঘটিত হয়; শ্বাস প্রশ্বাস মলমূত্র ও ঘর্ম্মাদির সাহায্যেও বাহুল্যরূপে শরীরের উপাদান পদার্থের ধ্বংস হইয়া থাকে। সুতরাং শরীর রক্ষা করিতে হইলে, শরীরের এই স্বাভাবিক ক্ষতি পরিপূরিত হওয়া প্রয়োজন। এই ক্ষতি পরিপূরণ জন্যই স্বভাবের নিয়মে ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া প্রাণীদিগকে খাদ্য গ্রহণে উপদেশ প্রদান করে।

ক্ষুধা ঘটিত যাবতীয় তত্ত্ব অদ্যাপি নিঃসন্দিগ্ধরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। আহার গ্রহণের নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইলে পাকস্থলীতে জ্বালা ও এক প্রকার বেদনা অনুভূত হয় এবং তথায় কোন কোন যান্ত্রিক পরিবর্ত্তনও সংঘটিত হয়, আবার আহারীয়বস্তু উদরস্থ হইলেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়া তদ্‌ঘটিত সমস্ত উদ্‌বেগ চলিয়া যায়; ইহা লক্ষ্য করিয়া অনেকেই মনে করেন যে, উদরই ক্ষুধাবোধের প্রকৃত স্থান; কিন্তু এ অনু-মান অভ্রান্ত নহে। ক্ষুধার সময় কোনও যন্ত্রাদির সাহায্যে

উদরাভ্যন্তরে অথবা দেহে পুষ্টিকর পদার্থ প্রবিষ্ট অথবা শোষিত হইলে আহার ব্যতীতও ক্ষুধার শান্তি হইতে পারে। আবার পাকস্থলী সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ থাকিলেও যদি অন্ত্রের কোন রূপ অস্বাভাবিক অবস্থা অথবা অপর রোগাদি জন্য ভুক্ত দ্রব্যের পুষ্টিকর অংশ শরীরের কার্য্যে গৃহীত হইতে না পারে, তবে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না।

শূন্য উদরে সাধারণতঃ ক্ষুধার উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু এরূপ কতকগুলি পীড়া আছে, যাহা উপস্থিত হইলে কতিপয় দিবস পাকস্থলী শূন্য থাকিলেও কিছুমাত্র ক্ষুধাবোধ হয় না। আবার প্রবল ক্ষুধার সময়েও শোক ভয় হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি কোন মানসিক ভাবের অতিরিক্ত প্রাবল্য উপস্থিত হইলে যে ক্ষুধার অনুভূতি তিরোহিত হইয়া যায়, বোধ হয় তাহাও অনেকে অবগত আছেন।

অতএব উপলব্ধ হইতেছে, ক্ষুধা উদরের অবস্থাজ্ঞাপক নহে। ক্ষুধা শরীরনির্ম্মাপক পদার্থসমূহের স্বল্পতার সূচক মাত্র। শরীরের বল হ্রাস ও উপাদান বস্তুর অপচয় ঘটিলে পাকস্থলীর একপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে, তথায় রক্ত সঞ্চারিত হয় এবং উহার গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া উঠে। পাকস্থলীর ঈদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিলে প্রাণিগণ এক প্রকার উদ্বেগ অনুভব করে, তাহাই ক্ষুধা বলিয়া উক্ত হইতে পারে। ক্ষুধার পর আহার গ্রহণ করিলে পাকস্থলীর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থি সমূহ হইতে এক প্রকার জীর্ণকর-রস নিঃসৃত হয় এবং পূর্ব্বে তথায় যে অতিরিক্ত রক্তের সঞ্চার হইয়াছিল তাহার হ্রাস হয় ও ক্ষুধার শান্তি হইয়া তদ্ঘটিত সমুদয় উদ্বেগ ক্রমে তিরোহিত হইয়া যায়।

কোন কোন শারীরবিদ্‌পণ্ডিত প্রকাশ করেন যে, সুস্থকায়-মনুষ্য পান আহার সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া ৮। ১০ দিনমাত্র জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে জল পান করিলে আরও কিছু দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকা যায়। যাহা হউক অভ্যাস এবং শারীরিক অবস্থা ভেদে এই সময় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব হইয়া থাকে। কিয়ৎকাল অতীত হইল আমেরিকাদেশীয় ডাঃ টেলার এ বিষয়ের পরীক্ষার্থী হইয়া ক্রমাগত ৪০ দিবস উপবাস করিয়াছিলেন।

দৈহিক অভাব পরিপূরণ জন্যই খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়; সুতরাং যে সকল পদার্থে দেহ নির্ম্মিত, খাদ্য বস্তুতে সেই সকল পদার্থ বর্ত্তমান থাকিলেই তাহা উৎকৃষ্ট এবং পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। আর যাহাতে সেই উপাদান পদার্থ যত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান, তাহাই তত অধিক পুষ্টিকর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অবিকৃত মনুষ্যদেহের প্রায় তিনচতুর্থাংশই জলীয় পদার্থ। এই জলীয় পদার্থের সমুদয় অংশই যে জল হইতে শরীরে গৃহীত হয়, তাহা নহে; তথাপি দৈহিককার্য্যে জলেরই প্রাধান্য, সুতরাং বিশুদ্ধ জল যে দেহপুষ্টির সর্ব্বপ্রধান সহায় একথা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু জল শরীরের রক্ষা-কার্য্যে যত প্রয়োজনীয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নির্ম্মাণ-কার্য্যে ততদূর প্রয়োজনীয় নহে; তজ্জন্য জল পুষ্টিকর শ্রেণীতে নিবিষ্ট হয় না। জল ব্যতীত শরীরের অপর উপাদানের মধ্যে মাংসিক-পদার্থই প্রধান, এজন্য মাংসিক-পদার্থ * যে বস্তুতে অধিক সাধারণতঃ তাহাই

* ময়দা বহুবার ধৌত করিলে যে অল্প অংশ অবশিষ্ট থাকে

অধিক পুষ্টিকর বলিয়া কথিত হয়। জল ও মাংসিক ব্যতীত অন্য নানাবিধ পদার্থও অল্পাধিক পরিমাণে শরীর নির্ম্মাণ ও রক্ষণে ব্যবহৃত হয়; খাদ্য বস্তুতে তাহাদের সকল গুলিরই অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক। লোকে সচরাচর যে সকল বস্তু আহার করে তন্মধ্যে ঐসকল পদার্থ প্রায় উপযুক্ত পরিমাণেই বর্ত্তমান থাকে।

যাহাহউক যে বস্তু পুষ্টিকর তাহাই যে উৎকৃষ্ট খাদ্য এমনও নহে, যাহা পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক খাদ্যশ্রেণীতে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আবার একজনের পক্ষে যে খাদ্য উৎকৃষ্ট তাহা যে সকলের পক্ষেই তেমন হইবে, এমতও নহে। অভ্যাস ও শারীরিক অবস্থাভেদে যাহা একের পক্ষে উপকার-জনক তাহাই অন্যের পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। বিবেচনা করিতে গেলে খাদ্যনির্ব্বাচন ও আহারগ্রহণ বিষয়ে অভ্যাস, রুচি, এবং নিজ নিজ বিবেচনা ও শারীরিক অবস্থার উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। এ সম্বন্ধে অভ্যাসের শক্তি অতি অদ্ভুত। অভ্যাস অনেক সময়েই স্বভাবের উপর কর্ত্তৃত্ব করে। অভ্যাসবলে খাদ্যনির্ব্বাচন এবং আহার গ্রহণ সম্বন্ধেও মনুষ্যের রুচি এত বিকৃত এবং প্রকৃতি এত পরিবর্ত্তিত হয় যে, যাহা খাদ্য বলিয়া কখন কল্পনাও

তাহাই মাংসিক বা গ্লুটেন; আর যে শুভ্রবর্ণ পদার্থ জলের সঙ্গে বাহির হইয়া যায় তাহারই অধিকাংশ ষ্টার্চ্চ বা শ্বেতসার। শ্বেতসারও শরীর-কার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কিন্তু মাংস নির্মাণে ইহাদ্বারা বিশেষ সাহায্য হয় না। শুষ্ক মাংসের ১০০ একশত ভাগে প্রায় ৭০।৮০ ভাগ প্রটেন বর্ত্তমান থাকে।

করা যায় না, তাহাও অনেকে আনন্দ সহকারে ভক্ষণ করে। পরন্তু অনেক স্থলে তদ্দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেও দেখা যায় না। রসনার তৃপ্তি সাধন জন্য অনেকেই দয়াধর্ম্মকেও সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হন।

গারোদিগের কুক্কুর-পিষ্টক ভক্ষণের বিবরণ বোধহয় অনেকেই অবগত আছেন; কোন কোন সম্প্রদায়ের লোক আন্তরিক তৃপ্তির সহিত গলিত দুরিত মৎস্য মাংসাদি উপাদেয় জ্ঞানে উদরস্থ করে। উত্তর হিমমণ্ডলবাসী স্কুইমো প্রভৃতি অসভ্য জাতীয় কোন কোন সম্প্রদায়ের লোক অপক্ক মৎস্য মাংস ও শোণিত প্রভৃতি পরম তৃপ্তি সহকারে উদরস্থ করে। অসভ্যদিগের মধ্যে অনেকে অতি সুখাদ্য-বস্তু বোধে নরমাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে। দক্ষিণাপথের অন্তর্গত গোন্দোয়ানা নিবাসী গোন্দনামক অসভ্যজাতির মধ্যে বিন্দরবর নামক এক বিশেষ সম্প্রদায় আছে, শ্রুত হওয়া যায় তাহাদের কোন আত্মীয় কুটম্ব সঙ্কট-জনক পীড়ায় আক্রান্ত হইলে কিম্বা বৃদ্ধ দশায় উপনীত হইলে, তাহাকে হত্যাকরতঃ সমুদয় বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে। তাহাদের বিশ্বাস, এরূপ করিলেই আত্মীয় ব্যক্তির অন্তিম শ্রদ্ধেয় সৎকার করা হইল! শৈবাল, ছত্রক, সর্প, গোধিকা, ভেক, মূষিক, শঙ্খ, শম্বুক ও নানা জাতীয় কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যে অনেক দেশের অনেক সম্প্রদায়েরই প্রিয়খাদ্য, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কয়েক বৎসর অতীত হইল ফ্রান্স দেশে খাদ্য বস্তুর একটি মহাপ্রদর্শনী হইয়াছিল, অসংখ্য প্রকার পশু পক্ষী ও অপর নানাজাতীয় জীবজন্তুর সুপক্ক

ও অপক্ক মাংস তথায় প্রদর্শিত ও পরীক্ষিত হইয়াছিল। সেই পৈশাচিক প্রদর্শনীতে কুম্ভীর মাংসই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মান লাভ করিয়াছিল। মনুষ্য সর্ব্বভুক্ বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা অসঙ্গত নহে।

আহার বিষয়ে মনুষ্যের অভ্যাস এবং রুচির প্রভাব এরূপ অদ্ভুত যে, তাহার নিকট অনেক সময়ে বিজ্ঞান-শাস্ত্রকেও পরাভূত হইতে হইয়াছে।

আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে বেনেজুয়েলা প্রদেশে ওরিনকোনদী তীরে অটোমাক নামে এক সম্প্রদায় অসভ্য লোকের বাস, তাহারা বর্ষার কয়েক মাস তদ্দেশীয় এক প্রকার মৃত্তিকা খাইয়া প্রাণধারণ করে। ওরিনকো নদীর জল কমিয়া গেলে উহারা নদী হইতে মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতি ধরিয়া ভক্ষণ করে বটে, কিন্তু বর্ষার কয়েক মাস যখন ঐ সকল প্রাণী দুষ্প্রাপ্য হয়, তখন প্রধানতঃ মৃত্তিকা ভক্ষণের উপরেই তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। একজন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক বহু দিবস উহাদের দেশে বাস করিয়াছিলেন; তিনি বলেন, উহারা প্রত্যেকে এক দিবসে অর্দ্ধ সের অপেক্ষাও অধিক পরিমাণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করে। উহাদিগের ঐ ভক্ষণীয় মৃত্তিকা ওরিনকো নদীর নানা স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহারা বিশেষ যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়া উহা সংগ্রহ করে এবং বৃহৎ বৃহৎ ভাঁটা প্রস্তুত করিয়া অগ্নির উত্তাপে কিঞ্চিৎ দগ্ধ করিয়া রাখে। আহার কালে উহা জলে ভিজাইয়া পরম তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করে। প্রত্যেকের কুটির সমীপে ঐ সকল ভাঁটা স্তূপাকারে সজ্জিত থাকে। মাটী

অটোমাকদিগের এতই প্রিয় খাদ্য যে, বৎসরের যে সময়ে প্রচুর পরিমাণে মৎস্যাদি পাওয়া যায়, তখনও অনেকে সাধ করিয়া কিছু কিছু মৃত্তিকা ভক্ষণ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ষার যে কয়েকমাস ইহারা প্রধানতঃ মৃত্তিকা খাইয়াই জীবন ধারণ করে, তখনও ইহাদের শরীর রীতিমত পরিপুষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটেনা। অথচ রসায়ন শাস্ত্রবিদ্‌পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, উহাতে দেহ-রক্ষার উপযোগী পদার্থ বিদ্যমান নাই।

যাহা হউক যদ্দ্বারা দেহ রক্ষিত হইতেছে, তন্মধ্যে দেহ রক্ষার উপযোগী কোনও পদার্থ বর্ত্তমান নাই, এ কথা সুসঙ্গত নহে। পণ্ডিতদিগের পরীক্ষাই যে যথাযথ রূপে সম্পন্ন হইতে পারে নাই, অবস্থাদৃষ্টে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। যে সকল মৌলিক পদার্থে মনুষ্যদেহ গঠিত, কোন বিশেষ প্রকৃতির মৃত্তি-কায় তাহার অধিকাংশ সামগ্রী উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। সৃষ্টির মূলে যে দুর্জ্ঞেয় শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহার সমুদয় তথ্য উদ্ভেদ করিয়া পদার্থ-সমূহের সমস্ত গুণ আয়ত্ত করা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মানবেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। জ্ঞান পিপাসু মানব চিরকালই সৃষ্টি-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া নূতন নূতন সত্যরত্ন উদ্ধার করিবে; সত্যের আবি-ষ্ক্রিয়ার কদাচ শেষ হইবে না। ইহাই মনুষ্যের পরম সুখ এবং ক্রমোন্নতির অব্যর্থ সন্ধান। জ্ঞানের অতৃপ্ত পিপাসার শান্তি হইলে মনুষ্যের আর সুখের বিষয় কি থাকিল? সত্যের পর সত্য লাভ করিবে এবং কর্ম্মশীল হইয়া মনুষ্য উন্নতির পর উন্ন-তিতে উপনীত হইবে, ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

সাবধানতা ও লোকনিন্দা।

যে সকল নর নারী বিবেকের শাসন গ্রাহ্য করে না, তাহাদের মধ্যেও অনেকে নিন্দাকে বড়ই ভয় করে ; আবার কেহ কেহ উহাকে নিতান্ত তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে। যাহারা ভয় করে তাহারা সহজেই কপটাচরণে রত হয়, আর যাহারা তাচ্ছিল্য করে তাহারা যথেচ্ছাচারের স্রোতে আত্মবিসর্জ্জন করে। উভয়েরই জীবন ঘৃণিত এবং মানব-সমাজের অমঙ্গলকর। কিন্তু যথেচ্ছাচারী অপেক্ষা কপটাচারী দ্বারা সমাজের অধিকতর অমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে।

কপটাচারী পথ-প্রান্তস্থ লুক্কায়িত বিষধরের ন্যায় অন্ধকার রজনীতে নীরবে দংশন করে, আর যথেচ্ছাচারী মত্ত-কুক্কুরের ন্যায় সশব্দে আসিয়া আক্রমণ করে। পথিক লগুড়াঘাতে কুক্কুর দংশন হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, কিন্তু লুক্কায়িত বিষধরের দন্তাঘাত হইতে আত্ম-রক্ষা করা বড়ই সুকঠিন। এই জন্যই বাহ্য দৃশ্যে সদাচরণশীল কপটাচারী অসাধু অপেক্ষা অসৎকর্ম্মশীল যথেচ্ছাচারীও প্রশংসনীয়।

আবার যাঁহারা সৎলোক, ধর্ম্ম ও নীতির শাসন যাঁহাদিগের শিরোধার্য্য, তাঁহাদিগের মধ্যেও এইরূপ দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় ; একশ্রেণী যদিও ন্যায়-পথে অবিচলিত থাকেন, কিছু অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া, লোকের নিন্দা প্রশংসায় দৃষ্টি রাখিয়া জীবন অতিবাহিত করেন ; আর এক শ্রেণী লোকের নিন্দা প্রশংসায় ভ্রূক্ষেপ না

করিয়া পর্ব্বতবাহিনী বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় ধর্ম্মানু-মোদিত সহজ পথে অবারিত বেগে চলিয়া যান। প্রথম শ্রেণীর লোক সাবধান, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক উদার। এস্থলেও যে সাবধান লোক অপেক্ষা উদার লোক অধিক গৌরবান্বিত, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

কিন্তু পৃথিবীতে সাবধানতার প্রচুর প্রয়োজন রহিয়াছে। সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যেমন উদারতা প্রার্থনীয়, তেমনই প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষেই সাবধানতাও প্রয়োজনীয়। জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে। উহাতে নানা ভয়, নানা বিভীষিকা, নানা বিঘ্ন, নানা বিপত্তি নিয়ত অপেক্ষা করিতেছে, হননেচ্ছু শ্বাপদকুল শিকারের অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতেছে; যাহারা সতর্ক ভাবে এই বিপদ-সঙ্কুল পথ অতিক্রম করিতে অনভ্যস্ত, তাহাদিগকে সময়ে সময়ে অবশ্যই অনুশোচনা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শত্রুর আক্রমণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া হয় ঘোরতর বিপন্ন হইতে হইবে, না হয় আত্মরক্ষা জন্য গন্তব্যপথ হইতে দূরে পলায়ন করিয়া বিপদের পর বিপদে পতিত হইতে হইবে। কিন্তু যাহারা উদার অথচ সাবধান, তাহাদিগকে কিছুতেই অবসন্ন হইতে হয় না।

আত্ম-শক্তির উপর নিষ্ঠা থাকা মনুষ্যমাত্রেরই অতিশয় প্রয়োজনীয় বটে; কিন্তু মানবীশক্তির বল অতি সামান্য, উহা সঙ্কট কালে সর্ব্বত্র আত্মরক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা আত্ম শক্তির পরিমাণ বুঝিয়া বিপদের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা সশস্ত্র থাকিতে পারে, বিপদের আক্রমণ তাহাদিগকে সহসা পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হয় না। যখন কোন অসাধারণ বীর

শত্রু-ব্যূহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন কেবল-মাত্র তাঁহাকে আপনার শক্তি ও প্রতাপের উপর নির্ভর করিলে চলে না; কিন্তু সাবধানে শত্রুর অগ্নি-গোলকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়, খড়্গের আঘাত প্রতিহত করিতে হয়, চর্ম্ম সঞ্চালনে শর-পাত ব্যর্থ করিতে হয়। সমর-সঙ্কুল দুর্গমজীবন-পথেও কেবল বল এবং সাহস থাকিলেই বিজয়ের সম্ভাবনা নাই। যিনি বাহুতে দুর্জ্জয় বল, হৃদয়ে প্রবল বিজয়াকাঙ্ক্ষা ও অটল সাহস, মস্তকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ এবং চক্ষে তীক্ষ্ণ সাবধানতা রক্ষা করিয়া জীবনের যুদ্ধে অগ্রসর হন, তিনিই বিজয়-গৌরবে প্রকৃত পক্ষে গৌরবান্বিত হইতে পারেন।

বিবেকের উপদেশে সর্ব্বোপরি লক্ষ্য রাখিয়া ন্যায়পথে গমন করা মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু অপূর্ণ মানব বুদ্ধির অল্পতা ও জ্ঞানের আবিলতা বশতঃ অনেক সময় সে সরল পথ চিনিয়া উঠিতে পারে না। বিশেষতঃ যাহারা সংসারের নূতন-যাত্রী তাহাদিগকে পদে পদেই দিগ্‌ভ্রান্ত হইতে হয়। তাহাদিগের মনের নূতন উন্মেষ, প্রবৃত্তির নূতন বিকাশ। তাহারা এক অদৃষ্ট-পূর্ব্ব নূতন রাজ্যে আসিয়া উপনীত। এখানে তাহারা যাহা দেখে, তাহাই তাহাদের পক্ষে নূতন এবং সুন্দর। অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব নূতন সুখ এবং সুখময় ভাব তাহাদের চিত্তকে উৎফুল্ল করে। সঙ্গিগণের প্রফুল্ল মুখচ্ছবি তাহাদিগকে আশ্বস্ত এবং উৎসাহিত করে। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না করিয়া মনের নানাবিধ নূতন বাসনা চরিতার্থ করিতে তাহারা ব্যগ্র হয়। তাহারা মনে করে

পৃথিবীতে সকলই সুন্দর, সকলই মধুর এবং সকলই পবিত্র। তাহাদিগের বন্ধুবর্গের সুন্দর মুখচ্ছবির অভ্যন্তরেও যে অনেক স্থলে প্রাণসংহারক গরল লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করে, তাহা তাহারা দেখিতে পায় না; তাহাদিগের পুরোবর্ত্তী কোমল-তৃণাচ্ছাদিত কুসুম-বিকীর্ণ পথে পত্রান্তরালে যে তীক্ষ্ণ-বিষ বিষধর সকল লুক্কায়িত, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। যদি এসময়ে তাহারা সাবধান না হয়, তবেই বিপদ রাশি চারিদিক্ হইতে আসিয়া তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়া ফেলে।

যাহারা প্রবৃত্তির উপর বিজয় লাভ করিয়াছেন মনে করেন, অসাবধান হইলে তাঁহাদিগকেও অনেক সময়ে প্রলোভনের পাশে নিগড়িত হইতে দেখা যায়। এজন্য তাঁহাদিগকেও সদা সতর্ক ভাবে জীবন-পথ অতিক্রম করিতে হয়। তাঁহাদিগকে অনেক কথা স্মরণ রাখিয়া চলিতে হয়, আন্তরিক দৃঢ়তা বলে মনের সাময়িক দুর্ব্বলতা দমন করিয়া তথায় সাধুতার প্রভুত্ব দৃঢ়তররূপে সংস্থাপিত করিতে হয়। যাহাদিগের ভবিষ্যতে দৃষ্টি নাই, এবং প্রবৃত্তির উপরে যথোচিত শাসন নাই, তাহারা সহজেই সৎপথ হইতে স্খলিত হইয়া অসাধুতার পঙ্কিল হ্রদে নিমজ্জিত হয়; এবং প্রলোভনের প্রশ্রয় দিয়া ক্রমে ক্রমে যার পর নাই অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

যদিও মনুষ্যের পক্ষে সাবধানতা এতই প্রয়োজনীয়, এবং অনেককে সাবধান হইতে দেখাও যায়; কিন্তু তাহাদের সকলেই যে, বিবেকের শাসন শিরোধার্য্য করিয়া কেবল বিপৎপাত দূর করিবার জন্যই সাবধানতার আশ্রয় লন, তাহা নহে; অনেকে কেবলমাত্র লোকের নিন্দা প্রশংসায় লক্ষ্য রাখিয়াই

সাবধানে জীবন অতিক্রম করেন; কিন্তু লোকপ্রীতি বা যশোলিপ্সা সৎকার্য্যের নিয়ামক হইতে পারে না। অশুভ পরিহার করিয়া যখন আমরা সাধুতার দিকে অগ্রসর হইব, তখন লোকে আমাদিগের গৌরব করিল কি অগৌরব করিল কিম্বা ভবিষ্যতে প্রশংসা করিবে কি নিন্দা করিবে, এই ভাবনায় অভিভূত হওয়া কখনও উচিত নহে। মানুষ যখন বিবেকের শাসন অপেক্ষা মনুষ্যের মতের অধিক গৌরব করে, যখন বিধির কীরিট অম্লানচিত্তে মনুষ্যের মস্তকে প্রদান করিয়া তাহারই পদ-সেবায় প্রবর্ত্ত হয়, তখন সৎপথ হইতে অধঃপতিত হইতে তাহার তিলার্দ্ধও বিলম্ব হয় না।

যশোলিপ্সা দ্বারাও পৃথিবীর মহৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার কোন গৌরব নাই, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে তাহাদ্বারা গুরুতর অনিষ্টও সংঘটিত হইতে পারে। সুনাম ক্রয় করিবার জন্য যাহারা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হয়, যশ তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে; কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া যাঁহারা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হইতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে যশোভাজন হইয়া থাকেন।

সুকৃত ব্যক্তি যদিও সুনামের ভিখারী নহেন, তথাপি সুনাম তাঁহার জীবনের উন্নতির জন্য যে কিছুমাত্র প্রয়োজনীয় নহে, এ কথা বলা যায় না। পরন্তু সুকৃতের জন্য সুনাম তত দূর প্রয়োজনীয় হউক বা না হউক, পৃথিবীর জন্য উহার প্রচুর প্রয়োজন রহিয়াছে। সৎলোকের যশোধ্বনি দিগ্-

দিগন্তে বাহিত হইয়া জনসমাজের যথোচিত উপকার সাধন করে। দৃষ্টান্তের তুল্য শিক্ষক আর কেহই নহে। নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রগুণে মহিমান্বিত মানবগণ পৃথিবীতে যে সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, তাহা যেমন সাধুর পথ প্রদর্শক, সেই রূপ অসাধুর অনুশাসক। অতএব ধর্ম্মানুমোদিত পথে থাকিয়া যদি সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পার, তাহা হইলে আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিবে।

অনেকে অনভিজ্ঞতা বা অনবধানতাবশতঃ হঠাৎ এরূপ অনেক কার্য্য করিয়া ফেলেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের সমস্ত সদ্‌গুণ এবং অতীত জীবনের যশোরাশি লোকে ভুলিয়া যায়। তাঁহাদের চরিত্র প্রকৃতপক্ষে মহৎ হইলেও তাহা এমন এক কৃষ্ণচিহ্নে কলঙ্কিত হয় যে, ভবিষ্যতে কিছুতেই সে কলঙ্ক ক্ষালিত হয় না।

পরন্তু প্রত্যেক মনুষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই দেখা যায়, কতকগুলি লোক হয় তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতা করে, নতুবা তাহাকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দর্শন করে। লোকের নিকট তাহাকে অপদস্থ করিতে ইহাদের আন্তরিক যত্ন বর্ত্তমান থাকে। তাহার সৎকার্য্যরাশির মধ্যেও নিন্দার কণিকামাত্র কারণ বর্ত্তমান থাকিলে, তদ্দ্বারাই তাহাকে বিলক্ষণ অপদস্থ করে। তাহারা লোকের নিকট এরূপ কৌশলময় বাক্যাবলী বিন্যস্ত করিয়া তাহার চরিত্রের সমালোচনা করে যে, তাহাদিগের মনে বিরুদ্ধ ভাবের সঞ্চার না হইয়া যায় না। বিশেষতঃ নিন্দিত ব্যক্তি যদি সমাজের উচ্চস্থানীয় ব্যক্তি হন, অথবা সৎলোক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তবে তাঁহার

নিন্দা লোকে অধিকতর আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে ; এবং নিন্দার কথা অনেকেই অবিচারিতরূপে বিশ্বাস করে। আবার নিন্দা অলীক হইলেও এরূপ ভাবে প্রচারিত হয় যে, অনেক সময় নিন্দিত ব্যক্তির তাহা খণ্ডন করিবার কোনও প্রকৃষ্ট পন্থা থাকে না। এইরূপে অনেক নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর গুরুতর কলঙ্ক আরোপিত হয়, অনেক নির্দোষ ব্যক্তিও মনুষ্য-সমাজে গভীর অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাজন হইয়া বাস করেন। অতএব নিন্দিত-পথ হইতে যতই দূরে অবস্থান করিতে পার, ততই আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিবে।

আবার পৃথিবীতে সকলেই যে অসাধারণ মানসিক শক্তি-সম্পন্ন তাহাও নহে, যাহাদিগের মনোবৃত্তি গুলি ততদূর বলশালী নহে, নিন্দা তাহাদিগের জীবনে অনেক অমঙ্গল আনয়ন করে। ইহাদ্বারা যে কেবল সম্মান ও লৌকিক-গৌরবের লাঘব হয় তাহা নহে, তদ্দ্বারা নিন্দিত ব্যক্তিদিগের মনের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি এবং কোমলতাও ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। এবং চিত্তের দৌর্ব্বল্যবশতঃ তাঁহারা লোকানুরাগে বঞ্চিত হইয়া সাধারণের উপর বীতশ্রদ্ধ হন ; সুতরাং এক পক্ষে কতকগুলি মূল্যবান সামাজিক সুখের দ্বার যেমন তাঁহাদিগের সম্মুখে চিররুদ্ধ থাকে, অপর পক্ষে সংসার তাঁহাদিগহইতে যে কিছু উপকার প্রত্যাশা করিয়াছিল তাহাও বিফল হইয়া যায়। যাহা হউক যদিও নিন্দার আক্রমণে মনুষ্য সহজেই আক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে অব্যাহতি পাইবার পন্থা জটিল নহে।

যদি সর্ব্বতোভাবে তোমার নীতি বিশুদ্ধ ও মন পবিত্র হয়, যদি কোনরূপ যশের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কেবলমাত্র সৎ-কার্য্যের জন্যই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হও, যদি স্বকীয় অকিঞ্চিৎকর সুখ সুবিধা ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র বিবেকবাণী লক্ষ্যকরতঃ ন্যায় ও ধর্ম্মপথে অবিচলিত থাকিতে পার, এবং পৃথিবীতে সততার সহিত বাঁচিয়া থাকাই যথার্থ মঙ্গল ও সুখের নিদান একথা প্রকৃত পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি নির্ম্মল চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নিয়ত যত্নশীল থাক, তাহা হইলে তোমার চরিত্রের উপর সাধারণের এমন একটি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া যাইবে যে, যতদিন স্পষ্টতঃ দোষের চিহ্ন প্রত্যক্ষ নাহইবে তত দিন নিন্দুকের কথায় কেহই কর্ণপাত করিবেনা। তখন অলীক নিন্দা তোমার স্বাভাবিক মহিমা খর্ব্ব করিতে পারিবেনা, এবং শান্তির পবিত্র উৎস পঙ্কিল করিতে সমর্থ হইবে না। তখন এমন এক নিরাপদ প্রদেশে তোমার যশের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে যে, তথায় নিন্দার ঝটিকা উৎপাত জন্মাইতে পারেনা এবং মিথ্যার কুহেলিকায় সে স্থান কদাচ অন্ধকারাবৃত হয়না।

সম্পূর্ণ